KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : [illegible]
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৬২/২ ৬২/৩	Year of Publication : শ্রাবণ - আশ্বিন ১৪০৮ কার্তিক - পৌষ ১৪০৮
	Condition : Brittle Good
Editor : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির প্রতিষ্ঠিত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৮১

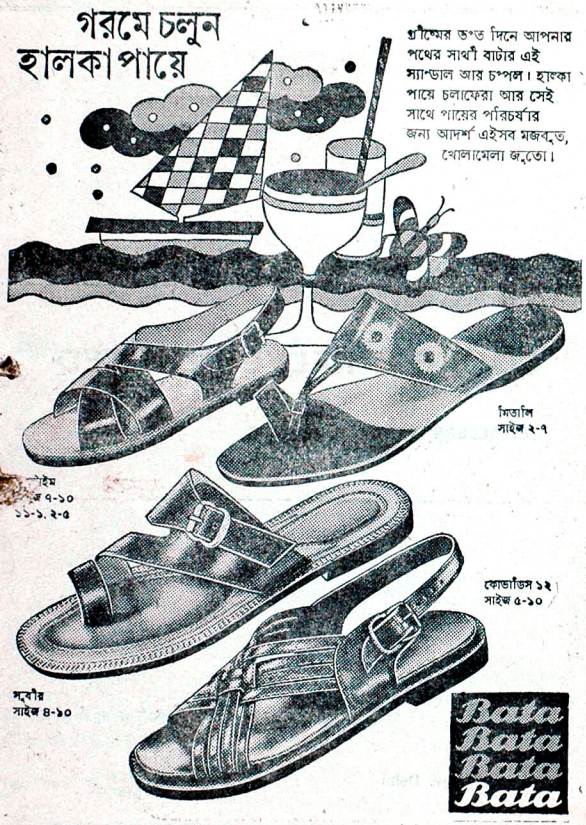

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৩৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৩৬ বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৮১

সূচিপত্র

অন্নদাশঙ্কর রায়। হুমায়ূননামা ১
অদীম রায়। আবহমানকাল ৬
শামসুর রাহমান। যখন আবহাওয়া খারাপ ৪৩
সুরজিৎ দাশগুপ্ত। রূপান্তর ৪৫
নবনীতা দেবসেন। ট্রাপিজ ৪৬
রফিক আজাদ। উদ্ভূত সেই পরিস্থিতিতে আমি যা যা করতে পারতাম ৪৭
রমাবাই দে। বৃষ্টি ৪৮
মিহির মুখোপাধ্যায়। ফিরে দেখা ৪৯
রমাকান্ত চক্রবর্তী। বাঙালী কৃষক ও বাঙালী রেনেসাঁস ৫৭
অমিয়ভূষণ মজুমদার। রাজনগর ৭৮
সমালোচনা। সুরেশচন্দ্র মৈত্র, সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অপন মজুমদার ১০১

সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

আতাউর রহমান কর্তৃক বাঙালা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা, ১৩ থেকে মুদ্রিত ও ৪৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা, ১৩ থেকে প্রকাশিত।

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৩৬ বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৮১

হুমায়ুননামা

অন্নদাশঙ্কর রায়

হুমায়ুন কবিরকে আমি প্রথম দেখি লণ্ডনে নিরঞ্জন পালের বাড়িতে। সেদিন ছিল বাঙালীদের দেশীয় মতে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ। বেশ মনে পড়ে কবিরের গলায় ছিল লাল রঙের টাই। আমি তাই নিয়ে একটু কৌতুক করি।

কবির চলে যান অক্সফোর্ডে। সেখানে পড়েন মডার্ন গ্রেটস। অর্থাৎ ইতিহাস, অর্থনীতি ও দর্শন। ইংরেজী নয়, যদিও ইংরেজীতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। বিষয় মনোনয়নটা তিনি ঠিকই করেছিলেন, দেশে ফিরে এলে একটা না একটা বিষয়ে চাকরি জুটে যেত। না জুটলে মূল বিষয়ে তো জুটতই। অমনি করে তিনি হন সব্যসাচী বা সবজান্তা। পরবর্তী জীবনে যে-কোনো বিষয়ে বলতে ও লিখতে পারতেন। বিদ্বান মহলে অপরাজেয় বাগ্মী ও তার্কিক। অক্সফোর্ডের ইণ্ডিয়ান মজলিশেই তাঁর হাতেখড়ি। পরে তিনি অ্যাসেম্বলিতে ও পার্লামেন্টে যাবেনই সেটা যেন পূর্বনির্ধারিত।

কমিউনাল হতে চাইলে হুমায়ুন কবিরকে ঠেকাত কে? অবিভক্ত বঙ্গের মন্ত্রী তো হতেনই, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপদেও পূর্বপাকিস্তানের নেতৃত্ব করতেন। কমিউনাল না হয়েও ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ও শিক্ষাসচিব হন। পরে তো মিনিস্টার অব স্টেট ও পুরোদস্তুর মিনিস্টার। ওর চেয়ে উচ্চপদ তো প্রধানমন্ত্রীর পদ। সেটা তিনি প্রত্যাশা করেন নি। হয়তো ওর চেয়ে দায়িত্বপূর্ণ পোর্টফোলিও আশা করেছিলেন। সে আশা অধিকতর বয়সে পূর্ণ হতো। যদি না ঘটে যেত একটা অঘটন। যদি না আসামের প্রভাবশালী মন্ত্রী ফকরুদ্দীন আলী আহমদ সাহেবকে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে আসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। সে অবস্থায় কবিরকেও আসন দিলে অন্যের ভাগ থেকে দিতে হতো। অথচ তাঁকে এক ধাপ নামিয়ে দিয়ে মিনিস্টার অব স্টেট করাও চলে না। তাই তাঁকে একেবারে বাদই দেওয়া হয়।

হুমায়ুনের পক্ষে ওটা বিনা মেঘে বজ্রপাত। বলেন, ওরা আমার পার্লামেন্টারি কেরিয়ারটাই

খতম করে দিতে চায়। বলে কি না, মাদ্রাজের গভর্নর হও। কী করে রাজী হই! বেচারার মুখখানি অন্ধকার।

আর কেউ হলে ও পদ লুফে নিতেন। বছর কয়েক বাদে আবার পার্লামেন্টে ফিরে যেতেন ও মন্ত্রিপদের জন্যে চেষ্টা করতেন। কিন্তু হুমায়ুন এ দেশের লয়েড জর্জ বা উইনস্টন চার্চিল। পার্লামেন্ট তিনি কিছুতেই ছাড়তেন না। গভর্নর পদের জন্যেও নয়।

হুমায়ুন যে একজন বর্ন্ পার্লামেন্টারিয়ান (born parliamentarian) এর পরিচয় পাই আমি আরও কয়েক বছর আগে। বলেন,—শিক্ষাসচিবের পদটা আমি ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিলুম। আমি চাই পার্লামেন্টে যেতে। তবে লোকসভার জন্য দাঁড়াতে পারব না। নির্বাচনের খরচ অন্তত ত্রিশ হাজার টাকা, রাজ্যসভায় যেতে মাত্র আড়াই টাকা খরচ। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্যদের ভোট যদি যথেষ্টসংখ্যক পাই।

ভোট তিনি যথেষ্টসংখ্যকেরও বেশী পেয়েছিলেন। কিন্তু ওঁদিকে জবাহরলাল ওঁকে সাফ বলে দিয়েছিলেন যে মন্ত্রিদের প্রত্যাশা থাকলে রাজ্যসভার সদস্য হওয়াই যথেষ্ট নয়। এখন থেকে ৎট শুধু লোকসভার সদস্যদের জন্যেই বরাদ্দ। হুমায়ুন তার জন্যে চিন্তিত নন। বলেন,—সংসার কী করে চলবে, জানতে চান? সদস্যহিসাবে আমি যা পাব তার সঙ্গে আরো কয়েক শো টাকা জুড়ে দিলে মাসে হাজার টাকা আয় হয়। সেই কয়েক শো টাকা আসবে লেখা থেকে। পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখব।

জবাহরলাল রাজ্যসভার সদস্যদের মিনিস্টার অব স্টেট করেন। হুমায়ুনকে দেন প্রথমে বিমান দফতর, পরে সংস্কৃতি দফতর। সাহিত্য আকাদেমি তার সামিল। হুমায়ুনের ইচ্ছাতেই আমি এর আগে ছিলুম সাহিত্য আকাদেমির সাধারণ সংসদ তথা কার্যকর পরিষদের সদস্য। সেই সূত্রে আমরা একসঙ্গে বসে কাজ করেছি। আমাদের সঙ্গে ছিলেন স্বয়ং জবাহরলাল, রাধাকৃষ্ণন্, আজাদ, পান্নিক্কার। সবাই তাঁরা দিল্লীতে থাকেন, যাতায়াতে তাঁদের সময় নষ্ট হয় না। আমার হয়। সাহিত্যের জন্যেই আমি সাহিত্য আকাদেমি ছাড়ি।

তেমনি, হুমায়ুনের নির্বন্ধেই আরো আগে আমি বিশ্বভারতীর সাধারণ সংসদ ও কর্ম পরিষদের সদস্য হয়েছিলুম। শান্তিনিকেতনে গেছলুম শান্তির আশায়। অশান্তির মেঘ দেখে দিশাহারা হই। তা হলে কি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করব? না, শান্তিনিকেতন ত্যাগ করব না, বিশ্বভারতীর সংসদ পরিষদ ত্যাগ করব। হুমায়ুনকে একথা জানিয়ে দিই।

জীবনে কতরকম ভুল করেছি, কিন্তু হুমায়ুনের উপরোধে সেই ভুলটি আমি করিনি যেটি করলে আমার পশ্চাত্তাপের সীমা থাকত না। তাঁর অভিপ্রায় ছিল যে রথীন্দ্রনাথের পরে আমিই হব উপাচার্য, তিনি থাকতে আমি যেন কর্মসচিব হয়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা ভালো স্টার্ট দিই। আমার উপর এমন অগাধ বিশ্বাস আমি আর কারো মধ্যে দেখিনি।

হুমায়ুনকে আমি লিখি যে উপাচার্য হবার উচ্চভিলাষ আমার নেই, কিন্তু কর্মসচিব হয়ে একটা স্টার্ট দিতে আমি রাজী, তবে এক বছরের জন্যে। শান্তিনিকেতনে গিয়ে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলে ও নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনটা পড়ে আমি সোজা বলে দিই যে আমার দ্বারা ও কাজ হবে না।

তখন হুমায়ুন বলেন,—তা হলে কাকে দিয়ে ও কাজ হবে?

আমি বলি,—দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রেজিস্ট্রার নিশিকান্ত সেনকে দিয়ে। তখন রথীবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দু'জনে হাজির হই নিশিবাবুর নিবাসে। ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়েন। তিনি রাজী হন এই শর্তে যে আমি যেন তাঁকে সাহায্য করি। খৈয়ালের খেসারৎ আমাকে দিতে হয়েছিল। অকারণে শত্রুসৃষ্টি।

হুমায়ুনের কাছে আমি নানাভাবে উপকৃত। তিনবার তিনি আমাকে দিল্লী থেকে ট্রাঙ্ক কল করে বিদেশে যেতে বলেন। রাশিয়ায় দু'বার, ফিলিপাইনসে একবার। আমি আমার অক্ষমতা জানাই। আর একবার তিনি আমাকে চমকে দেন,—কই, আপনি আমেরিকায় গেলেন না যে! আমি কানাঘুষা শুনেছিলুম যে আমাকে আমেরিকায় যেতে বলা হবে। কিন্তু ওটা শিকেয় তোলা থাকে, বোধহয় ছোঁ মেরে অন্য একজন কেড়ে নেন। দিল্লীতে ওরকম প্রায়ই হয়। তীর্থের কাকের মতো ধর্না দিয়ে সে থাকেন কতক লোক। তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কি আমার সাজে! হুমায়ুনকে বলি,—কই, আমাকে তো কেউ তেমন কোনো প্রস্তাব পাঠায় নি।

হুমায়ুনের সঙ্গে দিল্লীতে দেখা হয় তাঁর সেই মন্ত্রিপদ থেকে অপসারণের পর। বেচারার চেহারা দেখে আমার মায়া হয়। বলি,—তা গভর্নর না হয়ে আপনি ভালোই করেছেন। আপনার আসল ক্ষেত্র হচ্ছে পার্লামেন্ট। টান পড়লে লিখে সংসার চালাবেন। আপনার সদস্যপদ তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।

ততদিনে তিনি লোকসভার সদস্য হয়েছিলেন। আমি তাঁকে বলি,—এখন দিল্লীতে বসে আপনি করছেন কী! যান, বসিরহাটে যান। ওখানে পুলিশের গুলীতে একটি ছেলে মারা গেছে। আপনারই কন্‌স্টিটুয়েন্সি। আপনারই কর্তব্য।

সত্যি সত্যি তিনি বসিরহাট রওনা হয়ে গেলেন। কিন্তু পরে যেটা করলেন সেটা আমাদের কারো সঙ্গে পরামর্শ করে নয়। কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ। বাংলা কংগ্রেসের টিকিটে পার্লামেন্টে যাওয়া। সেইখানেই দাঁড়ি টানলে পারতেন। এর পরে ক্রান্তি দলের সাথে মিতালি। লোকদল প্রতিষ্ঠা। লোকদলের জন্যে একে ওকে খাড়া করা।

আমার সঙ্গে শেষ দেখা কলেজ স্কোয়ারে একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে সহযাত্রীরূপে। দেখি তাঁর কোলে একরাশ পুস্তিকা। লোকদলের প্রোগ্রাম। একখানা কিনি। পরম আশাবাদী হুমায়ুন বিশ্বাস করেন যে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনে তাঁর লোকদলের অন্তত ত্রিশজন প্রার্থী জিতবেন।

মেদিনীপুরে না কোথায় সভা করতে গিয়ে তিনি জখম হন। বিষম দুঃখিত হয়ে চিঠি লিখে সহানুভূতি ও শুভকামনা জানাই। তার উত্তরে তিনি লেখেন তাঁর লোকদলের অন্তত ত্রিশজন প্রার্থী কি জিতবেন না?

হাঁ, তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ওই অপরাজেয় আশাবাদ। লোকদল একদম ঘায়েল হয়। একটিও আসন পায় না। হুমায়ুনকে আর সান্ত্বনাবাণী শোনাই নি। জানি, এর কোনো সান্ত্বনা নেই। লোকদলের সঙ্গে সঙ্গে হুমায়ুনেরও রাজনৈতিক পরাজয়।

পরাজয়ের পর মৃত্যু। হয়তো পরাজয়ের ফল মৃত্যু। তিনি কিন্তু পার্লামেন্টারিয়ান রূপেই

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিধাতা তাঁকে সেই গৌরব থেকে বঞ্চিত করেন নি।

রাজনীতি যদি তাঁকে চুম্বকের মতো না টানত তাহলেই তাঁর প্রতিভার সম্যক্ পরিস্ফুরণ হতো। 'চতুরঙ্গ'র মতো অমন একখানা ত্রৈমাসিক পত্র পরিচালনা করা কি কম কৃতিত্বের পরিচায়ক! একজন গুজরাটীর মুখেও শুনেছি 'চতুরঙ্গ'-ই আদর্শ। ওর পেছনে লেগে থাকলে কি না করতে পারা যেত! বাংলার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীতেও তিনি সম্পাদনা করতেন 'ইণ্ডিয়া'। ওটা অকালে অন্তর্হিত হতো না, যদি তিনি লেগে থাকতেন। দক্ষতা তাঁর ছিল, কিন্তু মনোযোগ ছিল না।

আমি আশা করেছিলুম যে গভর্নরপদ না নিয়ে তিনি হয়তো কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ নেবেন। শিক্ষাবিদ্ মহলেও তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। তাহলে অবশ্য পার্লামেণ্টে হাজিরা দেওয়া চলত না। উপাচার্য হয়ে যিনিই পার্লামেণ্টে হাজিরা দিতে গেছেন তিনিই দুই নৌকায় পা রেখে পা ফস্‌কে পড়েছেন। অন্তত একজনের বেলা এটা সত্য। তা হলে কি এই রায় ইতিহাস দেবে যে হুমায়ুন কবির পার্লামেণ্টের জন্যে অন্যান্য সম্ভবপর পদ বিসর্জন দিলেন?

সংস্কৃতি দফতরের মীর্যে হুমায়ুন কবির না থাকলে সারা ভারত জুড়ে ও ভারতের বাইরে অত বিরাট আকারে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হতো না। সরকার থেকে তিনি বোধহয় এককোটি টাকা মঞ্জুর করিয়ে নিতে পেরেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সদরে তথা ভারতের সদরে তার থেকে রবীন্দ্রনাট্যশালা নির্মিত হয়েছে। সাহিত্য আকাদেমি থেকে বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ ও তাঁর উপর লেখা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। হুমায়ুনের নিজের উদ্যোগেও তাঁর সম্বন্ধে বই বেরিয়েছে।

হুমায়ুনের চরিত্রের অপর বৈশিষ্ট্য তাঁর চিরতরুণের মতো উৎসাহ ও উদ্যম। একই সঙ্গে একশোটা কাজ করা হচ্ছে। একটার পর একটা জায়গায় লাটুর মতো ঘোরা হচ্ছে। হুমায়ুন কবির কোন্‌খানে নেই?

একবার দিল্লীতে নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন হচ্ছে। সভাপতিত্ব করবেন হুমায়ুন কবির। কিন্তু মাদ্রাজে না কোথায় গেছেন, সেখান থেকে ফেরেন নি। তাঁর বিমানের পাত্তা নেই। বিজ্ঞানভবনের প্রবেশদ্বারে দেখি তারাশঙ্কর ও জৈনেন্দ্রকুমার। আমার দিকে এগিয়ে এসে দু'জনে আমার দুই হাত ধরে ভিতরে নিয়ে যান ও সভাপতির আসনে বসিয়ে দেন। আমি তো চিত্তির। সেই যে রূপকথায় আছে রাজহস্তী পথে বেরিয়ে যাকে খুশি একজনকে শুঁড়ে তুলে নিয়ে হাওদায় বসিয়ে রাজা করে দেয়। সভাপতির ভাষণ দিচ্ছি, হঠাৎ গোর ওঠে, 'হুমায়ুন কবির! হুমায়ুন কবির!' আমি তাঁকে তাঁর আসন ছেড়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

ভারতের লেখক মহলে সত্যিই তাঁর একটি সম্মানের স্থান ছিল। তখনও তিনি মন্ত্রী হন নি। সুতরাং সেটা তাঁর মন্ত্রিত্বের জন্য নয়। নানা মতবাদের লেখকের মাঝখানে তিনি ছিলেন যোগসূত্র বা শান্তিদূত। তাই তাঁকেই সভাপতি করা হয়। নইলে ঝগড়া বেধে যেত। আর সে কী ঝগড়া! সভার কাজ চালাতে গিয়ে আমি দেখেছি হিন্দী লেখকদের মধ্যেই একদল অহি তো একদল নকুল। কখনো মতবাদের দরুন। কখনো আঞ্চলিকতার দরুন। শান্তিজল ছিটিয়ে দেওয়া হুমায়ুন ভিন্ন আর কারো দ্বারা হতো না। তিনি ছিলেন সত্যি সর্বজনপ্রিয়।

বছর চল্লিশ আগে আমি যখন কুষ্টিয়ার মহকুমা হাকিম তখন একবার রেলপথে খান বাহাদুর

কবিরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে আলাপ। শুনি ফরিদপুরে তাঁর বাড়ীর কতক অংশ হিন্দু রীতিতে তৈরী, কতক মুসলিম রীতিতে, কতক পাশ্চাত্য রীতিতে। সব ধর্ম সমন্বয়ের সঙ্কেত। তাঁর পুত্র হুমায়ুনও সেইভাবে তৈরী হন নি কি?

বাংলা সাহিত্য হুমায়ুনকে ভুলে যাবে না। তাঁর প্রথম বয়সের কাব্যগ্রন্থের নাম 'স্বপ্নসাধ'। কবিরূপেই তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ। বিলেতে গিয়ে তিনি 'মৌচাকে'র জন্য লিখতেন অক্সফোর্ডের চিঠি। ছেলেমেয়েরা আগ্রহের সঙ্গে পড়ত। বাংলা সাহিত্যে তাঁর সাহিত্যিক প্রবন্ধের ও প্রবন্ধগ্রন্থেরও স্থনাম ছিল। মার্কসবাদের উপর তাঁর একখানি বই তিনি একবার আমাকে পাঠিয়েছিলেন। রাজনৈতিক মতবাদে হুমায়ুন ছিলেন গান্ধী জবাহরলাল ও মওলানা আজাদের কাছাকাছি। তার আগে ফজলুল হক সাহেবের কাছাকাছি। কিন্তু কোনো কালেই মুসলিম লীগ নেতাদের কাছাকাছি ছিলেন না। তরুণ বয়সেও তিনি ছিলেন খদ্দরধারী। শুনেছি সে বয়সে নিরামিষাশীও ছিলেন। কখনো তাঁকে সুরাপান করতে দেখিনি। অত্যন্ত সংযত প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন হুমায়ুন। একান্ত একনিষ্ঠ স্বামী। কলেজ জীবনে থাকতেন Y. M. C. A হোস্টেলে হিন্দু ব্রাহ্ম খ্রীস্টানদের সঙ্গে। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার দেটাও একটা হেতু। তবে তাঁর পিতার প্রভাবই বোধ হয় আদি কারণ। আর প্রধান কারণ তাঁর পত্নীর প্রভাব।

আবহমানকাল

অসীম রায়

শীতের সন্ধে নামছে শহরে। ধোঁয়া আর কুয়াশায় ট্রাম চলেছে। বাসের হেডলাইট একবার জলছে একবার নিভছে। আর এই ধোঁয়া কুয়াশা ছাড়িয়ে জগুবাবুর বাজারের কোণে ছাৎলাপড়া তেতলা ঐ বাড়িটার ঠিক মাথার ওপরেই জল জল করছে একটা তারা। সেখান দিয়েই মিছিলটা বাঁক নিল দক্ষিণমুখী। ছোট মিছিল। মাঝে মাঝে ধ্বনি উঠছে 'জেলের তালা ভাঙতে হবে।' অপেক্ষমান শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভার মৃদুস্বরে গাল পাড়ছে। একটা কুকুর ডাকছে মিছিলের অনুসরণকারী পুলিশের ছুটো ওয়্যারলেস ভ্যান লক্ষ করে।

টুটুল ভবনাথের মলিদা জড়িয়ে চলেছে। সেও যেন শীতের ঘুমন্ত জগতের একজন, মিছিলের হাঁক শুনে বেরিয়ে এসেছে। আসলে গত কয়েকদিন ধরে কলকাতার রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে বোমা পাথর অ্যাসিড বাল্ব নিয়ে যে খণ্ডযুদ্ধ চলেছে তার প্রত্যেকটার মধ্যেই টুটুল ছিল। কেন ছিল? কেন আছে? টুটুল মাঝে মাঝে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করে। ভবনাথ বলেছিলেন; সেন্ট্রাল সার্ভিসের জন্যে তৈরী হতে। তার বদলে টুটুল মিছিল করছে। উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য চারপাশের জগৎটাকে [illegible] দিতে হবে।

এ ব্যাপার নিয়ে টুটুলের সঙ্গে ছাত্রনেতা তপনের একচোট বাদানুবাদ হয়ে গিয়েছিল। টুটুল তপনকে প্রশ্ন করেছিল, —কেন আমরা ছাত্ররা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে মিছিল করব?—কেন করব? কেন করব মানে কী? তপন উল্টে প্রশ্ন করে। টুটুল বললে,—কেন করব বলুন? আর্থিক [illegible]ণে? জীবনবোধ জীবিকাবোধ এক বলে? আমার তো জীবিকাবোধ আমাকে বিলেত পাঠাবে আমার দাদার মতো। কী তাগিদে আমি রাস্তায় নামব?

তপন উত্তর দিতে পারে নি। উত্তর হিসেবে বলেছিল অবশ্য, 'শান্তি, প্রগতি, স্বাধীনতা', কিন্তু এগুলো কেন শুধু কথামাত্র নয়, এগুলোর অন্য সংজ্ঞা আছে তা বোঝাতে পারে নি। সে নজির দিয়েছিল বাংলাদেশের যুবকসমাজের আত্মত্যাগের কথা, যুগের পর যুগ যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে তারা সেই ঐতিহ্যের কথা, কিন্তু একথাগুলো টুটুলের কাছে তো ব্যক্তিগত তাগিদ নয় যদি জীবিকাবোধই শুধু জীবনবোধ হয়।

টুটুল সেই একটা প্রশ্ন করেছিল বরাবর,—আমাকে বুঝিয়ে দাও তপনদা, আমি কোন্ তাগিদে আমার সামনের রাজপথটা ত্যাগ করব?

—তুমি বড্ড হেঁয়ালি কথা বলছো টুটুল। প্রত্যেক দেশেই তরুণরা আত্মবিসর্জন দেয় আদর্শের জন্যে। এটা কোনো নতুন কথা নয়।

—আদর্শটা কী?

—আদর্শটা সমাজবাদ। এই ঘুণধরা সমাজটা ভেঙে চুর চুর করে দিতে হবে।

টুটুল এ কথার খানিকটা দূর পর্যন্ত মেনেছে কিন্তু সবটা মানে নি। শুধু রাজনৈতিক

আদর্শবাদের জন্যে সে রাস্তায় নামে নি, এটা সে টের পায়। শুধু এই বর্তমান শাসক পার্টিকে পাল্টিয়ে আর একটা পার্টিকে শাসক বানাবার জন্যে সে তো তপনের সঙ্গে হাত মেলায় নি। তপনের সঙ্গে সে রাস্তায় নেমেছে কারণ তার এখন গোটা জীবনের চেহারাটা পাল্টিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। সে যে এতদিন স্বপ্ন দেখেছে চূর্ণী নদীর ধারে বাল্যকালে, কলকাতার লেকের আশেপাশে বর্ষায় ভেজা ঘাসে পা ফেলে ফেলে, তার জন্যে। সেই অতীতটাকে বর্তমানে বইয়ে দেবার জন্যে। একটা ভাবের পরম্পরা রক্ষার জন্যে। এই সমস্ত ভাবের সঙ্গে একেবারে নিপট অফিসবাবুর যোগ নেই। সে একটু সময় চাইছে, বুঝতে চাইছে। তার এই বোমা লাঠি আর টিয়ার গ্যাসের মধ্যে আসাটা আসলে তার যৌবনের প্রতিবাদের সিম্বল। একথা সে ভবনাথকে তো নিশ্চয় বোঝাতে পারবে না, বোঝাতে পারবে না স্বর্ণসুন্দরীকে, এমন কি চোঙাকেও। তার এই প্রতিবাদের ভাষা তপনের কাছেও দুর্বোধ্য।

মিছিলটা চলেছে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের দিকে কারণ সেখানে রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন করছেন। অনশনকারীরা যাই ভাবুন না কেন, টুটুলের কাছে এই অনশন ধর্মঘট বাংলাদেশের যৌবনের প্রতিবাদের ধর্মঘট, বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার ধর্মঘট। টুটুল বুঝেছে রাজনীতিকে স্বপ্নময় করে তুলতে হবে, তাকে আর একটা তাৎপর্য দিতে হবে যেমন ১৯১৭ সালে রুশবিপ্লব দিয়েছিল। রুশবিপ্লব কি এই জন্যে যে আমেরিকার শ্রমিকের চেয়ে রুশ শ্রমিক কত বেশী রোজগার করে, সুযোগ সুবিধে পায় তা দেখানো? রুশবিপ্লব মানুষের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে, অথবা মানুষের স্বপ্নের আরও এক মহান রূপ দেবার জন্যে। আজ টুটুল যে মিছিলের সঙ্গে পা [illegible] কার্যকরী শক্তিতে তা নিশ্চয় কিছুই নয়, এক ফুঁয়েই নিভে যাবার মতো এ আয়োজন। কিন্তু টুটুলের কাছে এ এক প্রজ্বলিত শিখা; এই শিখা সামনে রাখা ছাড়া বাংলাদেশের প্রতিবাদের কোন ভাষা নেই। এটা কোন হঠকারিতার ভাষা নয়। এটাই মানুষের স্বপ্ন দেখার ভাষা।

যে পুলিশ অফিসারটি নেতৃত্বে ছিলেন পেছনের ওয়্যারলেস্ ভ্যানে তাঁর গলায় পুলক স্পষ্ট [illegible] মিছিলটা আর একটা বাঁক নেবার মুখে।—দে আর টেকিং বেকার রোড স্যর, অফিসারটি ওপরওয়ালাকে জানান। এক অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য তাদের সামনে হাজির। মিছিল একেবারে জেলখানার গায়ে গায়ে যাবে এই পরিকল্পনায় প্রায় এক আত্মহত্যার সামনে এগিয়ে চলেছে। ওয়্যারলেসে মেসেজ পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান ঠিক হয়ে যায়। সামনে কর্ডন, দুপাশে পাঁচিল, পেছন থেকে চার্জ।

জেলের তালা ভাঙতে যে মিছিল চলেছে সে মিছিলের অংশগ্রহণকারী টুটুল সেই জেল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল না যার অবস্থান আলিপুরে। সে তার কৈশোর-যৌবনের জেলখানার কথাটা চিন্তা করতে করতে মলিদাখানা সাপটে জড়িয়ে হাঁটতে থাকে। বি. এ. পরীক্ষায় সে খারাপ করেছে। এই তার জীবনের প্রথম অকৃতকার্যতা। আর এ ব্যাপারটা ঘটেছে ঠিক তখনই যখন সে তার চারপাশের চলমান জগতের সঙ্গে সঙ্গে তার বইয়ের অক্ষরগুলোর কোথাও একটা যোগসূত্র আছে বলে টের পাচ্ছে। এই প্রথম তার অকৃতকার্যতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে লেখাপড়া চিন্তা ভাবনার তীব্র প্রয়োজনীয়তা নতুন করে বোধ করছে সে। সেই আবাল্য মুখস্থ জগৎটা টান মেরে ফেলে দিয়ে এমন এক জগৎ সে খুঁজতে চাইছে যা ঠিক জাদুঘরে কাঁচের তাকে ন্যাপথিলিন-লাগানো জিনিস নয়। আর সেই আলোড়নে সে কী পাচ্ছে বুঝতে পাচ্ছে না, কিন্তু সেই গব গব করে আবিশ্ব বিষয়বস্তু গিলে

ফেলে হড় হড় করে পরীক্ষার খাতায় বমি করে ভাসিয়ে দেওয়া—এ আর সম্ভব না। সে আর জেলখানার জীব হতে রাজী নয়। সেই মুখস্থ জগতের জেলখানা টুটুল ভাঙতে চলেছে। আর সকলের সঙ্গে সেও স্লোগান দেয়,—জেলের তালা ভাঙতে হবে।

অন্ধকার এখন বেশ চেপে ধরেছে শহরকে। কুয়াশা আর ধোঁয়ায় দিক ঠাওর হয় না। বিশেষ করে টুটুলের মতো স্বপ্নাচ্ছন্ন শোভাযাত্রীর নয়, তার আর একটু সামনেই তপন, দুজন মাঝারী গোছের ছাত্রী নেত্রী গীতা বেলা কারুরই ঠিক এ অঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকায় জেলখানার ভূগোল সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তবে যারা সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের বোধহয় কোন দ্বিধা নেই। ডবল মার্চে প্রায় ছুটতে ছুটতে শোভাযাত্রীরা এগোয়। স্লোগানের আওয়াজ মুহুর্মুহু বেড়ে যায়। বিরাট উঁচু জেলের পাঁচিল অন্ধকারে দুর্গের কালো প্রাকারের মতো লাগে। সেখান থেকেও বোধহয় স্লোগানের আওয়াজ আসে। প্রায় দুশোটি ছেলেমেয়ে এবার উদ্দীপনায় তড়িৎস্পৃষ্ট। তবে ঠিক বোঝা যায় না, বোধহয় সামনে থেকে মিছিল পেছনে হটছে। মিছিলের মুখে ট্রাক ট্রাক ভর্তি পুলিশে রাস্তা বন্ধ। এবার পেছন দিক থেকে অন্ধকার ভেদ করে জোরাল হেডলাইট শোভাযাত্রীদের পিঠে এসে পড়ে।

একটা আওয়াজ আসে, বোধহয় তপনের,—কমরেডস্, প্যানিকি হবেন না। কিন্তু যিনি বলেন তিনিও আর সকলের সঙ্গে দৌড়চ্ছেন। টুটুলের সাথিটা প্রায় শেষ দিকে। তারা একবার ফিরে দেখলে, কালচে-নীল গরম ওভারকোট পরা পঁচিশ-ত্রিশ জন পুলিশ সার দিয়ে ভূতের মতো দাঁড়াল। তারপর তীব্র হুইসিলের আওয়াজ। লোকগুলো দৌড়ে এগিয়ে আসছে গাল দিতে দিতে। লাঠি চার্জ শুরু।

চারদিক বন্ধ। ছেলেমেয়েরা বেধড়ক মার খাচ্ছে। একটা ছেলের ধুতি খুলে যায়। গেঞ্জি আর রক্তের ধারা নেমেছে। একজন অজ্ঞান হয় চাঁদিতে বাড়ি খেয়ে। পরমুহূর্তেই বুটের ঠোক্করে পাশের ড্রেনে গড়িয়ে পড়ে। সামনের দিকে লোক মার খেয়ে পেছনে ছুটছে, পেছন থেকে ছেলেমেয়েরা সামনে ছুটছে। কেউ কেউ জড়াজড়ি খেয়ে আছড়ে পড়ছে। হঠাৎ কিছু ছাত্রছাত্রী বিদ্যুৎগতিতে ডান দিকে বাঁক নেয়। ডান দিকে সার সার সরকারী কোয়ার্টার। সবাই লাফিয়ে লাফিয়ে খোলা ড্রেনে পড়ে পাশের সরু ফালি জমি দিয়ে সেদিকে দৌড়য়। টুটুলও তার মধ্যে। সামনে খোলা লোহার গেট মুক্তির দিকে হাত মেলে দাঁড়িয়ে আছে। আর বোধহয় দশ-বারো হাত। এমন সময় টুটুলের কাঁধের ওপর ছায়া পড়ে। ঠক করে আওয়াজ হয় মাথায়, তারপর ঘাড়ে। কিন্তু টুটুল তখন যন্ত্রচালিত দুর্ধর্ষ আবেগে ধাবমান। সে বেগে বাধা পড়ে না। হুড়মুড় করে ছেলেমেয়েরা সেই একতলা কোয়ার্টারগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়তে থাকে। লেপ মুড়ি দিয়ে সিনেমার কাগজ পড়ছিলেন এক ভদ্রমহিলা। টুটুল আর তার সঙ্গের ছেলেমেয়েগুলো ঘরে ঢুকতেই ভদ্রমহিলা আতঙ্কে হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠেন। পাশে ঘুমন্ত সাত-আট বছরের ছেলেটা উঠে পড়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে কাঁদতে ভুলে যায়। ভদ্রমহিলার আতঙ্কিত চোখের চাহনি অনুসরণ করে টুটুল শার্টের কলারে হাত দেয়। জবজব করছে রক্তে-ভেজা কলার। সামনেও রক্তের ছিটে। ভাগ্যি ভেতরে পুলওভার ছিল। বেশ খানিকটা গড়ানো রক্ত চুষে নিয়েছে। টুটুল সেদিকে চিন্তা

না করে আর সকলের সঙ্গে বাথরুমে ঢুকে পড়ে। বাথরুমে দরজা খুলতেই এক মানুষসমান পাঁচিল তোলা উঠোন।

ইতিমধ্যে পুলিশের 'কুম্বিং অপারেশান' শুরু হয়েছে বলে পুলিশের সদর দপ্তরে খবর পাঠানো হল। যারা আশেপাশে আনাচে কানাচে আত্মগোপন করে ছিল তারা সবাই ধরা পড়ে, তারপর প্রিজন ভ্যানে তুলতে তুলতে বেধড়ক মার। এটা পরিষ্কার, পুলিশের লোকজন এদিকেই আসছে। প্রায় পঁচিশ-তিরিশ জন ছেলেমেয়ে এদিকে আটকা পড়ে। হয়ত ইতিমধ্যে খবর চলে গিয়েছে। আর মুহূর্ত দেরি না করে পাঁচিল টপকানো শুরু হয়। সবাই হাঁফাচ্ছে আর হাঁফাতে হাঁফাতে ফিসফিস করে কথা বলছে। টুটুলের পাশ থেকে একজন বললে— কলার গুঁজে দিন, কলার গুঁজে দিন। পাঁচিলের আলসেতে হাত রেখে রেখে ছেলেরা পাদানি করে। মেয়েরা টপটপ পাঁচিল টপকায়। আরও অনেকের সঙ্গে অন্ধকারে ঝাঁপ দেয় টুটুল।

এদিকে প্রচুর গাছ আর অন্ধকার। আশেপাশে আলো না থাকায় চাপ-চাপ অন্ধকারে অস্পষ্ট ম্লান নীতের জ্যোৎস্নায় হঠাৎ ছেলেমেয়েরা নেমে কেমন দিশেহারা হয়ে যায়। সামনেই একটা মূর্তি অনড়, বোধহয় শান্ত্রী। সকলের বুক ছাঁত করে ওঠে। একটি ছেলের সন্দেহ হতে একটু একটু করে এগোয়। অন্ধকারেও তার হাসির আওয়াজ আসে। সকলে এগোয়। চাঁদের আলোয় আ জীবন্ত এক প্রাক্তন ইংরেজ অফিসার, কোমরে তলোয়ার। টুটুল হাঁফাতে হাঁফাতে আকাশের দিকে তাকায়। মেঘ নেই। ঠিক সামনে অন্ধকার মাঠের এক প্রান্তে আকাশে জলজলে কালপুরুষ। মিলিটারি-সঙ্কেত-আঁটা একটা বোর্ড সামনে ছাঁটা ঝোপটার গায়েই। মাঠের এক প্রান্তে কতগুলো আমি তাঁবু। বোধহয় জাঠ ব্যাটালিয়ান। এবারে সত্যিই একজন জীবন্ত শান্ত্রী চোখে পড়ে। কাঁটাতারের পাশে নিশ্চল শান্ত্রী। বন্দুকের নল চকচক করে চাঁদের আলোয়।

আবার হুইসিল বাজে। এস্থানটাও যে নিরাপদ নয় তা স্পষ্ট। সেই ঘন গাছ আর অন্ধকারে ম্লান জ্যোৎস্নায় ছেলেমেয়েরা এদিক ওদিক করে। চারপাশে রাস্তা বন্ধ, সামনে পুলিশ মিলিটারি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এদিকে পুলিশের অপারেশান শুরু হবে। তারা এবার পেছন ফিরে হাল্কা পায়ে দৌড়য়। সামনে একটা জায়গা ফাঁকা, ঝোপ আর কাঁটাতার। এমন চওড়া ঝোপের সারি আর কাঁটাতারগুলো এতই মোটা নতুন আর ঘনসন্নিবদ্ধ যে তা ভেদ করা দুঃসাধ্য। তারা সবাই চেয়ে দেখে সামনেই আলোকিত নির্জন রাস্তা। দুটো প্রিজন ভ্যান বেরিয়ে গেল। তারপর আর একটা ট্রাক। কিন্তু সামনের রাস্তাটা ঠিক পেরোলেই মোড়ের মুখে একশো গজ দূরেই কলকাতার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। বাস স্টপে মুড়িসুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অপেক্ষমান যাত্রী। একটি তরুণীর হাতে বাজারের থলি, এক বৃদ্ধ ভিখিরীও হাত বাড়িয়ে আছে যাত্রীর দিকে।

এমন সময় চাপা অস্পষ্ট সঙ্কেত শোনা যায়। বিশ হাত দূরে তার কাঁটার নীচে এক জায়গায় দুটি ছেলে ঝুঁকে পড়ে কী দেখছে। একজন হাত নাড়িয়ে তাদের ডাকে। কাছে আসতেই দেখা গেল সেই অটুট কাঁটাতার ঝোপের পাঁচিলে এক ফাটল। বোধহয় বৃষ্টিতে এক জায়গায় মাটি ধসে গেছে। আর শেয়াল-কুকুর জাতীয় জীবও এরাস্তা দিয়ে আনাগোনা করেছে। প্রথম ছেলেটি হাতের নখ দিয়ে কুরে কুরে খাবলে সেই হিমশীতল শুকনো মাটি আলগা করার চেষ্টা করে। একটি

মেয়ে গাছের একটা ছোট্ট শুকনো ডাল আনে। পাঁচ-সাত মিনিটের চেষ্টায় ধড়খানা বেরোতে পারে এরকম একটা রাস্তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রগতিতে প্রথম ছেলেটি অন্তর্ধান হয়। গর্তের ওপরেই টান করে আঁটা শক্ত তারকাঁটা টেনে ধরে টুটুল। দ্বিতীয় ছেলেটি বেরিয়ে যায়। এবার টুটুল। গর্তের মুখে মুখ নীচু করে বাইরে তাকায়। হঠাৎ এক ঝলক আলো মুখের ওপর পড়েই সরে যায়। পুলিশের গাড়ির হেডলাইটের আলো। গোঁ গোঁ করে গাড়িটা বেরিয়ে গেল। আবার নির্জন আলোকিত রাস্তা। সাঁ করে বেরিয়ে যায় টুটুল। তারপর দ্রুত পায়ে রাস্তা পেরোয় কোনোদিকে না তাকিয়ে। বাসের মোড় যত এগিয়ে আসে, যত ঝাঁকা-কাঁধে বাড়িফিরতি ব্যাপারীদের দলটা এগিয়ে আসতে থাকে চোখের সামনে, ততই তার উত্তেজনা বাড়ে। অবিশ্বাস্য মুক্তির আস্বাদে টুটুল একেবারে অভিভূত। কাদামাখা ব্যাপারীর ঝাঁকার গা ঘেঁসে সে হাঁফায়। আবার সেই পরিচিত চলমান কলকাতার জীবন,—আগামী নয় বর্তমান কাল, এই বাসস্টপের আলোকিত বর্তমান কালে এসে সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে।

—কটা বাজে গা?

টুটুল চমকে ওঠে মাঝবয়সী মহিলাটির প্রশ্নে।—ও! সাড়ে আটটা…মানে আট-টা পঁয়ত্রিশ। ঘড়ির দিকে চেয়ে এতক্ষণে টুটুলের খেয়াল হয় তার বাবার মলিদাখানা শহীদ হয়েছে।

টুটুল সে রাত্তিরে বাড়িতে ফিরতে পারল না। তাদের বাড়িতে পুলিশ এসেছে। ভবনাথের [illegible] পুলিশ—একথা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। ভবনাথ বোকার মতো চেয়ে থাকেন, সঙ্গীন উঁচানো দুটো শান্ত্রী তাঁর গেটে। দুটো ট্রাকে পুলিশ থিক থিক করছে। এতক্ষণ পর সারাদিনের উত্তেজনায় ক্লান্তিতে একেবারে অবসন্ন লাগে টুটুলের। তার ওপর মাথা ঘুরতে থাকে। বাড়িতে ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবছিল, এমন সময় শান্ত্রীটি হাঁকে—ভাগো হিঁয়াসে। টুটুল সরে আসে। পা টেনে টেনে হাঁটতে থাকে। তারপর বাজারের পাশে ডাক্তার মুখার্জীর ক্লিনিকে গিয়ে ওঠে।

মোটাসোটা ভদ্রলোক। হিটলারের মতো গোঁফ, তাও সাদা, কিন্তু আশ্চর্য মায়াবী ভাসাভাসা চোখ। ভদ্রলোক ভবনাথের সঙ্গে দেশের একই স্কুলে পড়েছেন, ইছামতী নদীতে ঝাঁপ খেয়েছেন একসঙ্গে। এখন ফ্রি চিকিৎসা সরকারী হাসপাতাল থেকে পেনশান পাওয়ার পর। ডিসপেন্সারি বন্ধ করে ওপরতলায় উঠে যাচ্ছিলেন, এমন সময় টুটুল এল।

—এত রাতে? কী মনে করে? জানালার ছিটকিনি লাগাতে লাগাতে বলেন ভদ্রলোক। তারপর টুটুলের দিকে না চেয়েই বলতে থাকেন।—দাদার সঙ্গে রোজ বাজারে দেখা। আজ কিরকম মাছ খেলে? আমি-ই তো বেছে দিলাম। আমাদের সিরাজগঞ্জের লাল টকটকে রুই। ও মাছের জাতই আলাদা।

—কাকাবাবু, আমার মাথাটা দেখুন তো।

—কেন? কী হল? ও বাবা! এ যে মাথা ফাটিয়ে এসেছো?

ঝাঁকড়া চুল ফাঁক করতেই ক্ষতস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রক্ত কালো হয়ে চাপ বেঁধেছে।

—বোসো, ডাক্তার মুখার্জী উঠে গিয়ে জানালাটা খুলেই আবার বন্ধ করেন।

—পুলিশ? পুলিশ এসেছে?

—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বলেন,—আমার খাবারটা পরে দিও ঠাকুর। কলাইকরা একপাত্র জলে ছুরিকাঁচি দিয়ে হিটারে বসান। সিগারেট ধরিয়ে আস্তে আস্তে বলেন,—দাদা জানেন?

—বাড়িতে পুলিশ এসেছে।

—বাঃ!

দুটো সেলাই দিতে হল। বিশাল ব্যাণ্ডেজ পড়ল টুটুলের সারা মাথা জুড়ে। ব্যাণ্ডেজে গিঁট দিতে দিতে ডাক্তারবাবু বললেন,—এইখানেই খাবার দিয়ে যাচ্ছে। খেয়ে শুয়ে পড়ো। ওই যে ডিভান আছে। একটা বালিশ পাঠিয়ে দিচ্ছি। দাদাকে খবর পাঠাচ্ছি। দু-তিনটে দিন আমাদের ছাতের চিলেকোঠায় থাকো। ঘা শুকোক, বাড়ি যাবে।

বেরোতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ডাক্তারবাবু। পর্দা ফাঁক করে বললেন,—আমাদের সময় ছিল বন্দেমাতরম্, আর তোমাদের সময় ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ—এই তো?

টুটুল ক্লান্তভাবে বললে,—হুঁ।

দুই

অচিন্ত্য চৌধুরীর সাম্প্রতিক এক তীক্ষ্ণ পলেমিক, ‘অ্যাসিড বাল্‌ব বিপ্লব অথবা আত্মহত্যা’ খবরের কাগজের জগতে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণ, ঘটনার কান ধরে এমন মোচড়… ক্ষমতা এত তরুণ অনভিজ্ঞ সাংবাদিকের কাছে প্রায় আশাতীত। তাদের কাগজের এক কর্মকর্তা, যিনি অবশ্য খবরের ব্যাপারটা খুব বোঝেন বলে মনে করার কারণ নেই, তিনিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আসল জায়গায় বলে বেড়ালেন,—অচিন্ত্য উইল শেপ্ ওয়েল।

গত এক বছর থেকে কাজ করছে অচিন্ত্য কিন্তু এরই মধ্যে তার সম্ভাবনার কথা আলোচ্য বস্তু। আর অচিন্ত্য যে শেপ্ করবে তা যে শুধু সাংবাদিকতার বাঁধা সোজা অভিনবত্বহীন বছরের পর বছর একঘেয়ে চলার রাস্তা ধরেই নয় তার ইঙ্গিত সে ইতিমধ্যে দিতে শুরু করেছে। শানিত ঝকঝকে, কখনও করুণ হৃদয়স্পর্শী, সংবেদনশীলতায় উষ্ণ আবার ভাবাবেগে কখনও গদ্‌গদ, বিশ্লেষণের খুঁটিনাটিতে প্রাঞ্জল এই সব লেখাগুলো এক ধূমকেতুর আবির্ভাবের ইঙ্গিত বয়ে আনে। আর সেদিন বাড়িতে পুলিশের আগমনে ভবনাথ হতভম্ব, স্বর্ণসুন্দরী অসম্ভব ক্রুদ্ধ, বুড়ির সিনেমা যাওয়া কেঁচে যাওয়ায় সেও অসম্ভব বিচলিত, কিন্তু সবচেয়ে অপমানিত বোধ করেছিল চোভা—অচিন্ত্য চৌধুরী। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে পুলিশ কমিশনারকে। হতভম্ব ভবনাথ শোনে ফোনে চোভার ধমকানি। প্রথমে ওদিক থেকে বিশেষ পাত্তা পায় না। কিন্তু ভবনাথ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ওপরওয়ালার ভঙ্গীতে ধমকাতে পারে যা তিনি সারাজীবনে আয়ত্ত করতে পারেন নি। —আমি আপনার চেয়ে কম অ্যান্টি-কমিউনিস্ট না। বাট আই উইল্ বি দ্য ফার্স্ট ম্যান টু অপোজ হ্যারাসমেন্ট অফ্ অর্ডিনারি সিটিজেন্স।

অবশ্য ভাল গলে না। অচিন্ত্য আর এক ধাপ নামে। আর এক ডেপুটি কমিশনারকে সিটিজেন্স সম্পর্কে পুলিশের কর্তব্য প্রসঙ্গে দু লাইনের বক্তৃতা দেয়। বোধহয় অফিসারটিও একই

কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, সে সূত্রে আলাপও ছিল এবং সেই আলাপের ল্যাজ ধরে বলে,—বাট্ অমল, আই মিন্ বিজনেস, তুমি পুলিশ হটাও। ভবনাথ আঁচ করেন, পুলিশ অফিসারটি বোধহয় এত অন্তরঙ্গতার পরিচয় সত্ত্বেও আলাপনকারীর প্রাক্তন সাহচর্য সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ নয়, কারণ চোঙার দু-তিনবার তার নিজের নাম, তার কলেজের নাম পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন ঘটে। শেষে পরিচয়ের ক্ষীণ যোগসূত্র আবিষ্কৃত হলেও ওদিক থেকে 'আই শ্যাল সী অ্যাবাউট ইট্' এই ধরনের যান্ত্রিক সান্ত্বনার কথা ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না।

স্বর্ণসুন্দরী শাড়ি পাল্টে কাঁচাপাকা চুলগুলো হাত দিয়ে চেপে চেপে কানের দুপাশে পাতা কেটে ঘরের মধ্যে এসে বললেন,—আমি লালবাজার যাচ্ছি। এ কি মগের মুল্লুক নাকি ?

—চুপ করো মা, চুপ করো। তোমার ছোট ছেলে যে কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে গত দু বছর ধরে তার খেয়াল রাখো ? আমি তো চিরকাল মিডিওকার। কিন্তু তোমাদের যে জুয়েল, সে কী করছে তোমরা খোঁজ রাখো ? আমি সব জানি। একেবারে বদ্ধ পাগলামি। সিলি অ্যাডভেঞ্চারিজম্।

—তুই কি বলছিস পুলিশ এসেছিল টুটুলের জন্যে ?

—না না, আমি অতোখানি ওকে ক্রেডিট দিচ্ছি না। ও তো আসলে রাজনীতি কিছুই বোঝে না, আমি ওর মত সাপোর্ট করি না বটে, কিন্তু সব পার্টির খবর রাখি। সব ব্যাটা চোর।

স্বর্ণসুন্দরী এদিকে কান না দিয়ে বলে,—আমি যদি একবার গিয়ে পড়ি তবে দেখব ও কমিশনার ছ্যাকরা কি বলে! ওর বাবা তো তপেন মিত্তির। মৈমনসিংহে ডি. এস. পি. ছিল। আমাদের বাড়ি দুবেলা পড়ে থাকত।

—ওসব আদ্দিকালের বাসি কথা ছেড়ে দাও মা।

তারপর নিজের মনে চোঙা গজরায়,—বেশ ছিলিস কবিতা লিখতিস। বই পড়তিস। তোর এসব ডামাডোলের মধ্যে আসা কেন? আমি তো জানি, ওকে যারা নাচাচ্ছে তারা দুদিন পর কোথায় যাবে। আমাদের অফিসেও ওরকম লোক আছে। এককালে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করেছিল, বিপ্লব করেছিল। এখন সুড় সুড় করে গর্তে ঢুকেছে।

—তুই তোদের কাগজে ঢুকিয়ে নে না টুটুলকে।

—বাঃ, তুমি এমন বলছো যেন আমি কাগজের মালিক! তারপর বেজারভাবে বলে,—দেখি অফিসের এক মক্কেলকে ফোন করে। এরকম হিউমিলিয়েশানে যে পড়তে হবে ভাবি নি।

—ছাখ, তোরা চেষ্টা না করলে আর কে করবে। বাবাদের যুগ তো শেষ হয়ে গেছে।

—সেটা আমার চেয়ে আর কেউ বেশী জানে না, চোঙা ফোন ধরতে ধরতে বলে। তার সবচেয়ে বড় খুঁটিকে সে এ ব্যাপারে বিরক্ত করতে চায় না। যে বড় পেট্রন তার কাছে ছুটকো আবদার মানে হয় না। তার সঙ্গে সম্পর্কটা টেনে নিয়ে যেতে হয় সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক সম্বন্ধের ভেক পরে। সেই ভেক একদিন ছাড়া যায় কেবল নিজের জন্যে। টুটুলের জন্যে, এই রকম যেচে খাল কেটে কুমির ডেকে আনার জন্যে, এ সম্পর্কে নষ্ট হতে দিতে সে নারাজ। দ্বিতীয় খুঁটিকে সে ফোন করে।

—রতনদা, তোমার সঙ্গে সেই শনিবারের পরে দেখা হয় নি। বাট আই মাস্ট সে ইউ সাউণ্ডেড সো ডিভাস্টেটিংলি সিওর। আমার ব্যাঙোর জন্যে কান্না পাচ্ছিল।

ভবনাথ কান খাড়া করে শোনেন ব্যাঙোর সঙ্গে তর্কে রতনদা কি রকম তুখোড় কথাবার্তা বলেছে। শেষ পর্যন্ত বোতল ছুঁড়েছিল ব্যাঙো।

—হি ওয়াজ ডিস্গাস্টিং, আই মাস্ট সে হি ওয়াজ ডিস্গাস্টিং।

এবার বেশ কিছুক্ষণ চোঙা শুনে যায়। তারপর হাসির কমা-সেমিকোলন ছিটোতে ছিটোতে বলে চলে,—না না, এটা কী বলছো ? এটা কী বলছো রতনদা! রীণা কেন আমার দিকে ঝুঁকবে ? সি হ্যাজ ফার বেটার ক্লায়েন্টস্। বালু সেন আছে, তরফদার আছে, দে আর অল্ ব্রাইট বয়েজ। তাই না ?

চোঙা ফোনে গলাটা বেশ উঁচুনীচু করতে পারে। তার নবলব্ধ আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়তে থাকে গলার আওয়াজে।

—ও, একটা কথা বলতে বেমালুম ভুলে গেছি। যার জন্যে ফোন করছিলাম। আলিপুরে কোথায় কটা কমিউনিস্টদের বোমাপটকা চলেছে। ইউ নো দ্য ইউস্যুয়াল স্টাফ দ্যাট টেক্স দ্য নেম্ অব রেভোলিউশ্যান। ছোট ভাইটা ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেছে। হি ইজ নট একস্যাক্টলি এ কমি। একটু আইডিয়ালিস্ট টাইপ, বুকিশ, বোধহয় অ্যারেস্ট হয়েছে, দ্যাখো তো, অনিন্দ্য চৌধুরী। সোমকে বললাম, ব্যাটা গা করে না। তুমি রতনদা, খোঁজ নিয়ে একটু বল। আমি আছি।

ঠিক এই সময় ডাক্তার মুখার্জীর বাড়ি থেকে ফোন আসে। ডাক্তার মুখার্জী জানিয়েছেন টুটুল ওঁদের বাড়িতে আছে। দু-তিনদিন থাকবে। কোন ভাবনা নেই।

—আমি জানতাম। আমাদের বাড়ির ছেলে কখনও জেলে যাবে না। স্বর্ণসুন্দরী কেঁদে ফেললেন।

তিন

শীতকালে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যদি হাওয়া চলতে থাকে তবে বড্ড বেকায়দা অবস্থা। আর অফিসের যে জীপখানা চোঙা হাঁকাচ্ছিল তার পাশে ঢাকনিগুলো না থাকায় বৃষ্টির ছাটে তার পা ভিজে যায়। আমহার্স্ট স্ট্রীট পার হতে না হতে বৃষ্টির তোড় কমে। জীপখানা একটা গলিতে ঢোকে। ছোট গলি, তার পাশে ময়রার দোকানে প্রকাণ্ড বারকোশে ছানা ছানছে দুটো লোক। বাসি ছানা আর জলে ভেজা ছাই-আবর্জনার গন্ধে বাতাস ভারি। বৃষ্টিতে ভেজা একটা মরা বেড়াল-ছানাকে আর একটু হলেই চেটকে দিয়েছিল চোঙা।

এ পাড়াটায় যতবার চোঙা এসেছে আর বাড়িগুলোর দিকে চোখ পড়েছে ততবার চোঙার একটা কথা না মনে এসে পারে নি। বাড়িগুলো পচে যাচ্ছে। বছরের পর বছর মেরামতের অভাবে চুনবালি খসিয়ে পাঁজরা বার করে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার সমস্ত মন বিদ্রোহ করেছে এই ধ্বসে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী ক্ষয়িষ্ণু বর্তমান ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে চেয়ে। বারে বারেই স্থির করেছে আর আসবে না অতিথি হয়ে এই দারিদ্র্যের জগতে। কিন্তু প্রবল শারীরিক আকর্ষণে ঘুরে ফিরে এসেছে। আজও চলেছে বৃষ্টির ছাঁটে ভিজতে ভিজতে।

বাড়িটার সামনে একটা গ্যাসপোস্ট যার বাতি বহুদিন নিভে গেছে। সেখানে বৃষ্টিতে ভেজা

কাকটা জীপের শব্দে আওয়াজ করতে করতে উড়ে যায়। বাড়ির সামনে রঙচটা সাইনবোর্ডে লেখা 'ইয়াং টিউটরিয়াল কলেজ'। কোন কোন দিন দেখা যায় সবুজ লুঙ্গি পরনে টাকপড়া একটা লোক তক্তাপোশে উপুড় হয়ে পরীক্ষার খাতা দেখছে।

অবশ্য এ দৃশ্যটা খুব বেশী চোখে পড়ে নি। কালেভদ্রে সন্ধেবেলায় এদিকে চোডা পা মাড়িয়েছে। বেলাগড়ানো দুপুরের নির্জনতা তার বেশী পছন্দ। এ সময় অসময় হলেও অমলাকে একলা পাওয়া যায়। অন্যদিনের মতো পেছনের গলি দিয়ে চোডা ঢোকে। ভেতরের উঠোনে ডাঁই করে থাকা বাসন বৃষ্টিতে ভিজছে। অমলার তিন বছরের ছোট ভাইটা বিছানার এক কোণে উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। জানালাগুলো বন্ধ থাকায় ঘরখানা আবছা অন্ধকার। খাটের নীচে ধামা থেকে সজনের খাড়াগুলো উঁকি মারছে, মেঝেতে চাকাভাঙা খেলার মোটরগাড়ি। এই অন্ধকারে সবুজশাড়িপরা মূর্তিটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। আলনা গোছাচ্ছিল অমলা। চোডা পেছন থেকে এসে জাপটে ধরে।

—আস্তে, বুড় জেগে যাবে। কুচকুচে কালো লম্বাচওড়া মেয়েটা চোডাকে সাবধান করে। তারপর চোডার কাঁধে খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে হাসে। হাসির আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা যায় পাশের ঘরে। অমলার মা পাশ ফিরে ঘুমের ভাণ করেন। চোডা পাগলের মতো অমলার আগাপাস্তালা চুমু খেতে থাকে। এখনই যেন কেউ এসে যাবে, তার এ প্রক্রিয়াগুলোর বুঝি এখনই ছেদ [illegible], এ রকম একটা উদ্বেগ তার ঠোঁটে হাতে আঙুলে।

—একটু বোসো, একটু বোসো, মা ঘুমুচ্ছে, একটু বোসো না। একেবারে ঘোড়ায় চেপে এসেছো।

—ঘোড়ায় না, জীপে।

—পান খাবে?

—পান? দাও।

অমলা অন্তত তিন-চার বছরের বড় হবে চোডার চেয়ে। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই দেখা যাবে তার শরীরের লাবণ্য অটুট থাকলেও মুখের পেশী চামড়া শক্ত হতে আরম্ভ করেছে। দুবেলা হাঁড়ি ঠেলা, মায়ের দুরারোগ্য রোগে ক্লান্তিকর শুশ্রূষা, ছোট ছুটো ভাই সামলানো, ইস্কুল-মাষ্টার বাপের অজস্র ফাইফরমায়েস—এইসবের মাঝখানে থেকে তার আর কোন প্রত্যাশা নেই তার ছাব্বিশ বছরের জীবনে। চোডার আগে এক দূর সম্পর্কের জামাইবাবু আসতেন এইরকম জলভরা দুপুরে। তার দু-তিন বছর আগে পাড়ার মাস্তান শিবে ঝুঁকেছিল তার দিকে। তার নিজের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু অমলার বাবা রাজী হন নি। তারপর এক বিপত্নীক উকিলের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব এসেছিল। বয়সটা বেশী হলেও লোকটার বাড়ি ছিল কলকাতায়। এরকম সংসার ঠেলতে ঠেলতে উপনিশ্বাস উঠবার সম্ভাবনা কম ছিল। কিন্তু এবারেও বাবা কেঁচে দিয়েছে। এখন উমাচরণের হাবে ভাবে এটা স্পষ্ট মেয়ের বিয়ে দিতে সে চায় না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের আয়েস-আরামের ইচ্ছাগুলো বাড়ছে যেগুলো স্ত্রীর মারফত চরিতার্থ করার সম্ভাবনা নেই। তাই মেয়েকে সে ছাড়তে চায় না।

পানে অনভ্যস্ত হলেও ছোট এলাচ-দেওয়া মিঠেপানটা চিবোতে বেশ লাগে। পান চিবোতে চিবোতে চোডা অনেকটা ধাতস্থ হয়। যে উদ্দাম শারীরিক আবেগ গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠে প্রায়

নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছিল তা এখন সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে গেছে। চোডা সিগারেট ধরিয়ে আরামে টানতে থাকে।

—তুমি একটা বুলুর ব্যবস্থা করে দাও, অমলা হঠাৎ বলে ওঠে।

—বুলু? কেন? কী হল?

—বুলুর একটা চিঠি পেলাম। ফুড ডিপার্টমেণ্টের সেই ছেঁদো চাকরিতে পড়ে আছে কবে থেকে। লিখেছে, জীবনে কিছুই করতে পারল না।

—তা আমি কী করব? চাপা অসন্তোষ চোডার গলায় ফুটে ওঠে।

কেমন এক ভয়ের ছায়া নামে অমলার চোখে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,—আমি তো পড়াশোনা কিছুই করতে পারলাম না।

আবার এক অসন্তোষের চাপ চোডার বুকের উপর চেপে বসে। সব সময় এই কাণ্ড হবে, আগেও হয়েছে। কিছুতেই অমলাকে সে আলাদা করে নিতে পাচ্ছে না। অমলার দেহ, তার বুক পিঠ ঠোঁট হাত পা, তার সব কিছু এই ধ্বসেপড়া পচেযাওয়া বাড়ির সারি আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সঙ্গে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছে।

—তোমার হাতটা দাও অমু। দুঃখ কষ্ট তো সকলেরই আছে। বলে হাতটা টেনে নেয় চোডা নিজের হাতের মধ্যে। সে যেন জোর করে তার পারিবারিক সমস্যা থেকে অমলাকে ছিনিয়ে নিতে চায়।

অমলা সত্যিই খানিকক্ষণের জন্যে তার ভাইয়ের কথা ভুলে যায়। বিহ্বল হয়ে সে চোডার গা ঘেঁষে বসে থাকে। পাশের ঘরে অমলার মা গলা ঝাড়েন। চেপে বৃষ্টি নামে। বুড় খাটের ওপর জুতসইভাবে শোবার জন্যে দু-তিনবার টাল খায়। ধারেকাছেই বাজ পড়ে।

—পশ্চিম দিনাজপুর তো! একেবারে অজ পাড়াগাঁ। জল আর মেঘডাকার আওয়াজ ছাপিয়ে অমলার গলা ভেসে আসে।

—মন খারাপ লাগলে সিনেমা দেখবে। আজকাল গাঁয়ে গাঁয়ে সিনেমা।

—অতো ঘন ঘন সিনেমা দেখার পয়সা কই। সব কেটেকুটে তো একশো আশীটা টাকা। পাশের ঘর থেকে দীর্ঘশ্বাসের মতো অমলার মা বলেন। তারপর কারুর গলায় কোন আওয়াজ নেই। শুধু জলের একটানা শব্দ। রাস্তার গায়ের দেয়ালে ফাটা পাইপ থেকে ছড়ছড় করে জল পড়ে।

—একটু চা করি। ঘরের কোণে তোলা উনুনটা নিয়ে খুটখাট করে অমলা। পাশের বাড়ির রেডিও থেকে গান বাজে, 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছো দান।'

চাপা অসন্তোষের দমক গলা পর্যন্ত উঠে আসে চোডার। চায়ের জল চাপিয়ে আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে অমলা আসে।

—কী স্যর! চুপ করে কেন? আঙুল দিয়ে চোডার কোমরে খোঁচায় অমলা।

—তুমি বড্ড গেঁয়ো অমলা! ভীষণ গেঁয়ো! এই জন্যেই তোমাদের নিয়ে মুশকিল! চোডার মুখ লাল হয়ে যায়।

—উঃ! কী আমার সাহেব রে!

—সাহেব নই, কিন্তু আমি গেঁয়ো নই তোমাদের মতো! চোঙা গরম হয়ে বলে।

আসলে চোঙা হয়ত বলতে চায় অন্য কিছু, পশ্চিম দিনাজপুর প্রসঙ্গে সে বিরক্ত, সেই সব দাবী আদায় করার মুহূর্ত এটা নয়। এই রকম জলভরা তার দামী সময় নষ্ট করে সে এসেছে 'দু দণ্ড শান্তির' জন্যে অমলার কাছে। বাস্তবিক আধুনিক বাংলা কবিতা বিশেষ না পড়লেও জীবনানন্দ দাশের বহুলপরিচিত কবিতার লাইনটি তার মনের মধ্যে খেলে যায়। অমলার সান্নিধ্য তার ভাল লাগে। তার সান্নিধ্য অমলার ভাল লাগে। এর ওপর আবার কী থাকতে পারে? এই ধরনের কিছু ভাবনা তার মনের মধ্যে ভিড় করেছিল। আর একবার মনে হচ্ছিল রতনদার সঙ্গে এই সময়টা কাটালে বোধহয় আখেরে লাভ হত। রতনদা তার সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসেন। কারণ চোঙার মতো গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে কোন বুদ্ধিমান তরুণ তাঁর কথা আগে শোনে নি দিনের পর দিন। প্রায় দিন পনেরো হল রতনদার সঙ্গে বসা হয় নি।

—আসলে বাবা খুব আশা করেছিলেন বুলুর সম্পর্কে। অমলা আবার পশ্চিম দিনাজপুর প্রসঙ্গটা নিয়ে আসে।

—সব বাপেরাই তাই করে, চোঙা বেজারভাবে বললে।

—ও পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল কি না।

—তাই বুঝি!

—তোমার বুঝি বিশ্বাস হয় না আমাদের? আমরা গরিব বলে বুঝি···

চোঙা বিরক্তিতে হাত দুটো তোলে! তার একটা চালু বাংলা নাটকের লাইনও মনে আসে, 'আমরা গরিব হতে পারি কিন্তু নীচ নই।'

চায়ের শেষ চুমুকটা দিয়ে বলে,—কেন বিগড়োচ্ছ। আমি একবার বলেছি এসব কথা? তারপর একটু থেমে বলে.—আর কে না গরিব বলো! আমরা সবাই গরিব। কোন না কোন ব্যাপারে আমরা সবাই গরিব। তাই না?

চোঙা অর্থপূর্ণভাবে অমলার দিকে চায়। অমলা ঠিক বুঝতে না পেরে হাসে। তারপর হঠাৎ মাথা নীচু করে বলে,—তুমি আমাকে যতখানি বোকাহারা ভাবো আমি ঠিক ততখানি নই।

অমলা যখন কথাটা বলে তখন তার সাদামাটা গেরস্ত মেয়ের মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে। তার যৌবনের স্বাচ্ছন্দ্যে এমন একখানা ভরাট ভাব আছে যা সহজেই চোঙাকে টানে কিন্তু রেগে গেলে তাকে বড্ড বেয়াড়া লাগে চোঙার। তার গ্রাম্যতা তাকে আরও পীড়া দেয়।

—কাল সন্ধেটা আমার আর ছুটি আছে। চলো একটা সিনেমা দেখে আসি।

অমলা হঠাৎ ফুঁসে ওঠে বলে,—তুমি আমাদের বাড়ি আসো কেন?

—আমি তো তোমাদের বাড়ি আসি না, আমি তোমার কাছে আসি।

—হ্যাঁ, কেন আসো?

—কারণ তোমাকে আমার ভাল লাগে। তোমার সাহচর্য···

এবার অমলার বড় বড় চোখগুলো জ্বলজ্বল করে। বলে,—আমরা ঘাসে মুখ দিয়ে হাঁটি না। তার মুখখানা লালচে দেখায়।

চোঙা বেজার মুখ করে বসে থাকে। বৃষ্টি ধরে আসছে। পাশের বাড়ির রেডিওতে পণ্ডিত রবিশঙ্কর মিঁয়া কি মল্লার বাজাতে সুরু করেন।

অমলা হঠাৎ রেগে গিয়েছিল। অনেক কড়া কড়া চোখা চোখা সত্যি কথাগুলো ফলা উঁচিয়ে বেরিয়ে আসছিল তার মুখ দিয়ে। তুমি তো আসছো আমার শরীরটাকে চাটবার জন্যে, এইরকম অজস্র সুংসিত কথা ছুটবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল জিভের ডগায়। কিন্তু হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদতে সুরু করে। সে কি আর কিছু আশা করতে পারে না পুরুষ মানুষের কাছ থেকে এই থামচানো খাবলানো সান্নিধ্যটুকু ছাড়া?

চোঙা উঠে আসে অমলার কাছে। অমলা তাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে তার কান্না সামলায়। সত্যিই অসম্ভবের পেছনে ছুটে কি লাভ? এমনি চাপাচাপি করলে চোঙা আসবে না। তাতে তার কি লাভটা হবে? উমাচরণ নতুন করে চেষ্টা করবে বিয়ে দেবার? পাড়ার ছেলেরা সবাই আজকাল সেয়ানা। এ বাড়িটা তারা এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানে যে একেবারে পাগল না হলে কেউ যেচে বিয়ে করবে না এ বাড়িতে। অনেক স্বপ্ন দেখেছে আগে, সিনেমার গল্পের মতো স্বপ্ন। কিন্তু এখন আর দেখে না। দেখে লাভ? জলে ভেজা চোখে অমলা তাকায় চোঙার দিকে। চোঙা সেই রোদনভরা মুখখানা দু'হাত দিয়ে সবলে টেনে তুলে চুম্বন করে।

—কাল টিকিট কাটছি। সাড়ে পাঁচটায় আসব।

—এসো।

চোঙা উঠে পড়ে। বাইরে বৃষ্টি ধরে গেছে। সামনে ভেজা হলদে বাড়িটায় বিকেলের রং ধরেছে। পার্কের কোনায় গোলোকচাঁপার গাছ জলে-ভেজা থোলো থোলো সাদা ফুলে ভরা। মৃদু গন্ধ আসে। গলিটায় জল জমেছে। নীচু গীয়ারে গাড়ি বার করে আনে চোঙা। বড় রাস্তার মুখেই উমাচরণ। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে রবারের গাম্পশু পরে হন্ হন্ করে রাস্তার মোড়ের দিকে চলেছেন। জীপখানার দিকে চোখ পড়তেই উমাচরণ চেঁচাতে থাকেন,—চোঙা, চোঙা! চোঙা জীপখানা রাস্তার পাশে দাঁড় করায়।

—তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে। এসো।

প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোঙা নামে, লোকটা একেবারে গবেট, কিন্তু অমলার বাবা, হাতে রাখা দরকার।

—আপনাদের বাড়ি থেকেই তো আসছি।

—না না ওদিকে না, এদিকে এসো।

চোঙা অবাক হয়ে দেখল পাড়ার রেস্তোঁরাতে ঢুকলেন উমাচরণ।

—কী খাবে বল?

চোঙা বিরক্ত হয়ে বললে,—না না, আমি কিছু খাব না। এক কাপ চা খেয়েছি, আর এক কাপ খেতে পারি।

—সে কি! শুধু চা?, এই বয়সে? একটা ডিমের ডেভিল খাও।···কালী, কালী!

হোটেলের বয় এলে বললেন,—চিকেন কারী হবে?

—হাফ প্লেট ?

—না, ফুল প্লেট।

উমাচরণ মাথা নীচু করে তাঁর হাড়বেরকরা আঙুলগুলো দিয়ে হাড় চিবোতে থাকেন। মাড়ির দুটো দাঁত না থাকায় চিবোনর চেয়ে চোষার কাজটাই ভাল চলে। কব্জি দিয়ে ঝোল গড়িয়ে পড়তে থাকে।

মাংস চুষতে চুষতে উমাচরণ বলেন,—ডাক্তার বলেছে প্রোটিন খেতে। ঝালে অথবা স্বাদের পরিতৃপ্তিতে নাক দিয়ে জল গড়িয়ে আসে উমাচরণের। হাতের পিঠ দিয়ে মুছতে মুছতে বলেন,—তারপর কিরকম বুঝছো ? দেশের অবস্থাটা ?

—আপনার কি জরুরী কথা ছিল বললেন না ?

—সবুর করো, সবুর করো। তোমাদেরই শুধু সময়ের দাম আছে, আমাদের নেই, না ? সকাল থেকে ছেলে ঠেঙাচ্ছি। সন্ধ্যেবেলায় বাড়িতে ফিরে আবার কোচিং ক্লাস। মেয়েটার আবার উড়ু উড়ু মন হয়েছে। কি যে করি ! আসলে তোমাকে বলি বাবা, কাকে আর বলব। মেয়েটা ভাল নয়।

ভদ্রলোক আধময়লা রুমাল বার করে পরিতৃপ্তির সঙ্গে মুখ মুছতে থাকেন। আর চোঙার মনে হতে থাকে সে একগলা কাঁদার মধ্যে ক্রমশই ডুবে যাচ্ছে। সাধারণ বুদ্ধিতে তার মনে হয় পাড়ায় আর পা মাড়ানো উচিত নয়। কারণ এই অত্যন্ত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবেশে বাস করা অধিবাসীগুলোর সঙ্গে রোদে জলে পচে যাওয়া চুন-সুরকি আর জংধরা কড়িবরগাগুলোয় কোন ফারাক নেই। আর যে-ই এখানে আসুক না কেন, যতই চেষ্টা করুক তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে, তাকে এই ক্লেদ ক্রমশ স্পর্শ করবে। এখনই উঠে পড়বে কিনা ভাবছিল। চেয়ে দেখলে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ছুঁচলো টাকপড়া চোয়ালভাঙা তামাটে মুখখানা কালো চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ গোল করে তাকে দেখছে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে উমাচরণ বললেন,—ওসব বলা ছাড়ো। তোমরা হলে জার্নালিস্ট। কিরকম দেশের অবস্থা বলো। আসলে তোমরা যাই বলো, এভরিথিং ডিপেণ্ডস্ অন ইণ্ডিয়াক্রিয়ালাইজেশান। আমাদের স্কুলের নবেন, ছোকরা তুখোড় ছেলে, থাকবে না এ লাইনে, সে বলছিল লণ্ডন টাইমসে লিখেছে উমাচরণ গড় গড় করে কয়েক লাইন ইংরেজী বলে যান।

এবার ক্লান্তিবোধ করে চোঙা, এই সুন্দর মেঘলা দুপুরের স্মৃতিটার জন্যে বড্ড দাম দিতে হচ্ছে বোধ হয়।

—অমলার একটা বিয়ে দিয়ে দিন না !

—কখন কি করব বলো ? আমার কি মরবার সময় আছে !

চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে হঠাৎ বললেন,—বাই দা বাই, কয়েকটা টাকা ধার দিতে পারো ? ইলেকট্রিক বিলটা দেওয়া হয়নি। কাল লাস্ট ডেট। স্যামনের উইকেই পেয়ে যাবে।

এতক্ষণ চোঙা খেয়াল করে নি। তার পাতলা ফিনফিনে হাউই হাফশার্টের বুকপকেট থেকে কয়েকখানা দশটাকা নোট উঁকি দিচ্ছে।

—গোটা কুড়ি দিলেই হবে। উমাচরণ হাতখানা বাড়িয়ে দেয়।

টাকাটা দিয়ে চোঙা উঠে পড়ে। কুড়ি টাকায় কেনা মেঘলা দুপুরটার স্মৃতি তাকে মুহূর্তের জন্যে পীড়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে চুম্বনের অপেক্ষায় উন্মীত অমলার মুখ, তার জলে ভেজা চোখের পাতা আর মরিয়ার মতো দুহাত দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরা আলিঙ্গনের স্মৃতিও তার মনটা ভারী করে তোলে।

—বোস না, আর এক কাপ চা হোক। তোমাকে আমার আসল কথাটাই বলা হয় নি।

—কী ? চোঙা ভয়ে ভয়ে তাকায় উমাচরণের দিকে।

—দুখানা টিকিট, সামনের সোমবার চ্যারিটি ম্যাচের জন্যে, মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল। ছোকরা নবেনটা ধরেছে, ওকেও দেখাতে হবে।

চোঙা ঘাড় নাড়িয়ে হাঁটা দিচ্ছিল। উমাচরণ পেছন থেকে ডাক দিয়ে বলে,—অমলার হাতে দিয়ে গেলেই হবে।

ইঞ্জিন স্টার্ট দেবার আগে আর একটা ডাকও চোঙার কানে আসে। রেডিয়োতে শিশুদের আসর। একটি কচি গলার ডাক আসে,

ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে,
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে,

চোঙা সোঁ করে বেরিয়ে যায়।

চার

—আমি বললুম উইলি ব্রাণ্ডকে, বার্লিনের মেয়র—তোমরা ইণ্ডিয়ার ব্যাপারটা ঠিক বোঝ না। ইণ্ডিয়াক্রিয়াল ডেভালোপমেণ্ট ইজ এ মাস্ট, বাট ইটস্ কাল্‌চারাল হেরিটেজ ইজ্ এ মাস্ট টু। খুব মন দিয়ে শুনলে, বুঝেছো ?

সেই বাদলা দুপুরের মাস দুয়েক পর আর এক ভ্যাপসা গরমের অপরাহ্নে রতন সরকার বোঝাচ্ছিলেন চোঙাকে। অবশ্য ভ্যাপসা গরম টের পাওয়া যাচ্ছিল না। ঘরটা এয়ারকণ্ডিশাণ্ড। চোঙা ফ্রিজিদীতল লেমন স্কোয়াশে চুমুক দিচ্ছিল। তিন সপ্তাহ পশ্চিম জার্মানী ফেরতা রতন সরকারের ড্রইংরুমে যে কটি জার্মান দ্রব্য হাজির হয়েছে তার প্রত্যেকটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে চোঙা। টেপ রেকর্ডার, টাইপরাইটার, ক্যামেরা, লেডিজ ছাতা, ছোট ছেলের জন্যে খেলার জোয়াল এরোপ্লেন, মায় একটা ওভারকোট, বর্ষাতি কিছুই বাদ দেন নি।

—বুঝলে, গ্র্যাণ্ড দেশ ! গ্র্যাণ্ড ! চোখ বুঁজে বললেন রতন সরকার।

—বৌদির ছাতাটা ভাল হয়েছে, চোঙা হেসে বললে। হাসলে তার সরু মুখে পাতলা গোঁফের নীচে দাঁতগুলো ঝলকায়। ঘিয়ে তসরের প্যাণ্টের ওপর লালনীল ডোরাকাটা হাউইয়ান শার্টে চোঙা ঝলমল করে।

সেই তারুণ্যের প্রতিমূর্তির দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে রতন সরকার বললেন,—ভুল করলে অচিন্ত্য। বৌদির ছাতা গত বছর টোকিও থেকে এনেছি। এটা মেয়ের বায়নার জন্যে আনতে হয়েছে।

—ওদের রিকনস্ট্রাক্‌শান কেমন দেখলেন ?

—একসেলেণ্ট। মনেই হয় না দেশের ওপর দিয়ে এত বড় ঝড় বয়ে গেছে। আর কি কাজ করতে জানে মশাই! আমরা ওদের ফ্যাক্টরি দেখতে গিয়েছি। লোকগুলো পুতুলের মতো কাজ করে যাচ্ছে। একবারও ফিরেই তাকালো না। গ্রেট! গ্রেট!

উৎসাহের আতিশয্যই রতন সরকারের চরিত্রের প্রধান আকর্ষণ, যদিও চোঙাকে বিশেষ অভিভূত দেখায় না উৎসাহের এই অভিব্যক্তিতে। ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী পাজামা, রিমলেস্ চশমা এবং অসম্ভব বাজখাই গলা—এই তিনের সমন্বয়ে একই সঙ্গে একাউণ্টস্ সার্কুলেশান বিভাগের সর্বময় কর্তা। চোঙার মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে রতন সরকারের সমস্ত ব্যাপারে উৎসাহ আসলে একটা পোজ্, হয়তো ভেতরে লোকটা ক্লান্ত, সিঁটিয়ে আছে। কিন্তু কাগজের জগতে একরকম টগবগে সবজান্তা ব্যক্তিত্ব না হলে চলে না। অন্য কাগজেও ওপরের মহলে একই অবস্থা। কোন বিষয় সম্পর্কে বেশ খানিকটা উপলব্ধি বা কৌতুহল থাকা বোধহয় অপ্রয়োজনীয়। ঐ ধরনের ব্যক্তিত্বও সে অফিসের আনাচে কানাচে দেখেছে। চোঙার ধারণা রতন সরকারের মতো তারা কখনো 'টপে' উঠতে পারবে না। টপে উঠতে গেলে বেশ হাল্কা ডানায় ওড়া দরকার।

—তোমার তো ইয়োরোপটা দেখা হয়নি ?

—কোথায় আর হল ? আপনারা কেউ দেখাচ্ছেন না, হাল্কা হেসে চোঙা বলে।

—আরে এই তো স্বরু করলে। পরে দেখবে একেবারে ঘেঁতরে যাবে, আজ আমেরিকা কাল রাশিয়া। আমি তোমার বউদিকে বলি, আর এ ছোটাছুটি সয় না। তার ওপর যেরকম প্লেন ক্র্যাশ হচ্ছে। বাইরে যাবার কথা শুনলেই বউদির মন খারাপ।

—আপনি আবার বম্বে গেছিলেন ?

—ঐ ভোজরাজ বললে, দ্য গ্রেট মারাঠী রাইটার, যেতে হল। আরে ভোজরাজের বইতে রাজকাপুর নেমেছে। এই যে কয়েকদিন আগে সিনেমার সামনে লাঠিচার্জ হল। ও তো ভোজরাজের নাটক। মারাঠীরা, আই মাস্ট সে, গ্রেট পিপ্‌ল। ওদের লিটারেচার, কালচার ···

রতন সরকার উৎসাহের আর একটা বোতল খুলে ছিটিয়ে দিলেন মারাঠী সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য।—বাট আই মাস্ট সে, ওদের এক মিনিস্টার চোর। গভর্মেণ্টের টাকায় একটা রাজপ্রাসাদ তুলেছে ম্যারিন ড্রাইভে। আমার কাছে সব ডকুমেণ্ট আছে। তাছাড়া, গলা খাটো করে বললেন,— হি কিপস উইমেন।

—আপনি কিসের জন্য গিয়েছিলেন বম্বেতে ?

—ও সেইটাই বলা হয়নি। আমাদের বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হোল না ওখানে ? এদিকে তো কোন কাগজেই কিছু বেরোয় নি। ওদিকে সব বড় বড় কাগজে আমার বক্তৃতা ছেপেছে। ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলাম তো!

সাহিত্য সম্পর্কে চোঙার বিশেষ উৎসাহ নেই, তবে রতন সরকার বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কি বক্তৃতা করলেন সে সম্পর্কে কৌতুহল জাগে।

—কী বললেন ?

—আমি বললাম, কিস্‌সু হচ্ছে না। ওসব সাহিত্য-টাহিত্য কিস্‌সু হচ্ছে না। আমাদের লেখকদের গ্রামে যেতে হবে।

—তাই বললেন ?

—তাছাড়া কী ? তোমাদের রবিবাবুও গ্রামে পড়েছিলেন। শরৎবাবু তো গাঁয়েই মানুষ। আর বঙ্কিম সারাজীবন জেলায় জেলায় কাটান। আমি সমস্ত সোসিও-ইকনমিক কারণ দেখালাম এই ডেকাডেন্সের!

—আপনি যে কমিউনিস্টদের মতো বলছেন, মৃদু ঠাট্টায় চোঙা বলে।

—ওয়েল্, আই কাণ্ট হেল্প ইট, ফিনফিনে পাঞ্জাবী পরা ঘাড়টা বিলিতি কায়দায় ছুমড়ান। এবার স্টেট এক্সপ্রেস্ সিগারেটের টিনটা চোঙার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নিজে একটা ধরান।

—দ্যাখো, ওদের মধ্যে বুদ্ধিশুদ্ধি ভালই রয়েছে। ওরা যদি বিদেশের দিকে না তাকিয়ে থাকত! ···এসব তুমি তো অনেক পড়াশোনা করেছো। তোমাকে আর কি বলব ? আচ্ছা, তুমি বলেছিলে না তোমার এক ভাইয়ের কথা···কি মাথায় ক্যাড়া নেচেছিল, জেলের তালা ভাঙতে হবে···সে সব মিটেছে ? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে ? রতন সরকার পাটভাঙা পাজামা পরা পাখানা নাচাতে থাকেন।

চোঙাকে চিন্তিত দেখায় মুহূর্তের জন্যে। আস্তে আস্তে বলে, আপনি যেরকম বলছেন সেরকম হলে ভালই হোত। তবে ঠিক অতো সোজা নয় রতনদা।

— দ্যাখো অচিন্ত্য, কুড়িতে কমিউনিস্ট আর তিরিশে অ্যান্টি-কমিউনিস্ট, এ যদি কেউ না হয় আমি বলব সে ছোকরা গেঁজে গেছে।

—আপনার কথা সত্যি তাহলে খুবই ভাল হয় রতনদা। কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হয় আমার ভাইয়ের ক্ষেত্রে ওটা হবে না। তাছাড়া ও আবার ইন্টেলেকচ্যুয়াল! আমি ওকে বুঝি না।

—ও বাবা! সে কি গো! রতনদা সশব্দে হেসে ওঠেন। ঐ সব যারা দাড়ি রাখে, পাইপ খায়, আর চুলে তেল না দিয়ে সর্বক্ষণ রেভোলিউশ্যানের কথা বলে বেড়ায় ?

—সেরকম হলেও বেঁচে যেতাম। আশ্চর্য রতনদা, এই বছর খানেক বছর দুয়েকের মধ্যে ও একেবারে পাল্টে গেল। আমাকে আজকাল বিশ্বাস করে না। খোলাখুলি কথাই বলতে চায় না।

—আই সি, আই সি, তুমি বুর্জোয়াদের দালাল! রতন সরকার সশব্দে হাসিতে ফেটে পড়েন।

—হয়তো তাই! কিন্তু না হয়েই বা কি করতাম। জেলের তালা ভাঙতে যেতাম! চোঙা নিজেকেই উদ্দেশ করে যেন কথাগুলো বললে।

—একজ্যাক্টলি, একজ্যাক্টলি!

হঠাৎ ইংরেজি শব্দটিতে খাঁটি বাংলা 'জ'-এর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে মুখ তোলে চোঙা। এত দেশবিদেশ ঘুরছে লোকটা, হরদম ইংরেজি বলছে, অথচ ইংরেজি সাধারণ উচ্চারণগুলো শুদ্ধ করে বলবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না ভদ্রলোক। ভেবে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

রতনদা চোখ বন্ধ করে কয়েকবার সিগারেট টেনে আবার দম ফিরে পান।—দ্যাটস্ দ্য পয়েণ্ট। আরে বাবা, দেশ স্বাধীন হয়েছে। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে দেশের নেতাগুলো উঠে পড়ে

লেগেছে। তার মাঝখানে খ্যাপার মতো বিশ্রব বিশ্রব করে চিল্লাচিল্লি লাগালেই হল। আরে একটু চান্স দে! তোদের রাশিয়াতে কদিন লাগল বল্।

হঠাৎ উঠে গিয়ে দেরাজের ডালা খোলেন রতনদা। কলমের একটা বাহারে বাক্স বার করে চোঙার হাতে দিয়ে বললেন,—এই পেলিকেনটা তোমার জন্যে এনেছি।

চোখদুটো খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠলেও চোঙা বলে,—এসবের কি দরকার ছিল রতনদা।

—আরে তোমরা হলে রাইটার। তোমাদের পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান দ্য সোর্ড। তোমরা ভাল কলম না ব্যবহার করলে কারা করবে!

তারপর নীচু স্নেহজড়ানো গলায় বললেন,—তোমার লেখাটা তাহলে সামনের উইকে দিয়ে দিচ্ছো।

—আমি ঠিক পরশু দিন দিয়ে যাব।

কিছুদিন পরেই বোম্বাইয়ের এক বিখ্যাত সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকায় চোঙার লেখা 'জার্মানি অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া' রতন সরকারের নামে বেরোল। লেখাটার ওপরে খুব চিন্তাশীল পোজে লেখকের ছবি।

পাঁচ

—গুরু, তুই নাকি আজকাল ভার্নাকুলার কাগজে একটা কেউকেটা? আমি বাংলা কাগজ পড়ি না। বাট রীন্ কিপস মি ইনফর্মড। শী ইজ ফ্রাইটফুলি বেঙ্গলী!

রীন্ মানে রীনা—স্বরূপের ছোট বোন। চোঙার পাশের চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর তার হাল্কা গোলাপী রং করা ছুঁচলো নখ দিয়ে অন্যমনস্কভাবে দাগ কাটছিল। এবার দাদার দিকে তার সুন্দর চোখদুটো তুলে বললে—বাঃ, আমরা বাঙালী না?

কালোর মধ্যে এমন দীপ্ত সতেজ সৌন্দর্য বাস্তবিক চোখে পড়ার মতো। তার চেহারা বেশবাস দেখে এক নজরেই বোঝা যায় সে যেমন জ্যাবড়া সৌন্দর্যে অবিশ্বাসী তেমনি আবার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিকাশের অস্বাভাবিক চেষ্টায় কৃত্রিম নয়। কালোপেড়ে সাদা টাঙ্গাইলের সঙ্গে কালো সাটিনের ব্লাউজ, ফাঁপানো একরাশ চুল কানের পাশ দিয়ে তুলে খোঁপা বাঁধা, কানে দুটো মুক্তো, আর কোথাও গয়না নেই। তার চেহারার সবচেয়ে বড় গুণ তার মুখের গভীর সারল্য, প্রায় শিশুর মতো সজীব আলোয়ভরা চাহনি।

—জাস্ট এ পট বয়লার, স্বরূপ। সিরিয়াসলি বলছি, তোর অফিসে একটা চাকরি দে!

—সে কি! তুই একটা রাজনৈতিক সংবাদদাতা অফ অ্যান এ ক্লাস পেপার। তুই আমাদের মতো বাষ বিক্রি করবি?

সামনের টে থেকে প্যাস্ট্রি তুলে নিয়ে চোঙা বললে,—বাবা, বড় সাহেব হয়ে আছো। সেল্‌স ম্যানেজার অফ এ কম্পানি নোন্ থ্রাউট দ্য ওয়ার্ল্ড। ওসব সীরিয়াস কথা ছাড়। নীলুর খবর কি?

—নীলু তো আমেরিকায়।

—বুলা, ওর ভাই? তোকে যে বরাবর টেনিসে হারাত?

—শাট আপ্, বুলা কোন দিন আমার সঙ্গে এঁটে ওঠেনি। তবে ওর ব্যাক হ্যাণ্ড রিয়েলি

মার্ভেলাস্। ও যদি লেগে থাকতো তবে ইণ্ডিয়ার আর একটা কৃষ্ণান্ হয়ে বেরোত।

বুলার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে একটু গলা বোধহয় চোঙার কেঁপেছিল। রীনা কফির পেয়ালা থেকে একবার তার দিকে চায়। স্বরূপ বললে,—রিন্, ইউ ডোন্ট গেট হিজ্ লেটার্স?

—না!

স্বরূপ উদাসভাবে বললে,—লা মার্টিনেয়ারে সব চেয়ে ব্রাইট বয় ছিল আমাদের মধ্যে। হি টুক টু বটলস্। ঐ যে সেই রাজকুমারটা, তুমি তো দেখেছো চোঙা, আর ওর বোন, ওরাই শেষ করলে। দ্যাট ওল্ড স্টোরি অফ্ হেলেন।

—কি যে বলো দাদা! আপত্তি করলে রীনা।

—তুমি তো সব জানো। চোঙা জানে না তাই বলছি। আমি ব্যাপারটা সব ক্লীয়ার করে দিচ্ছি। বুলা ফেল ইন্ লাভ উইথ রিন্। কিন্তু রিন্ আবার···হুস্···গলা ঝাড়ল স্বরূপ। তার বোনের ঠিক উল্টো সে। টুকটুকে ফর্সা, ইতিমধ্যেই টাক পড়তে শুরু করেছে। চড়া কমলা লেবু রঙের হাউইয়ান শার্ট আর লাল মুশলো বের করা হাসিতে তাকে চোঙার সহপাঠী বলে মনে হয় না। বছর খানেক হল ভুঁড়িও বেশ জানান দিচ্ছে।

—বুলা নেভার ইম্প্রেস্ড মি। হি ওয়াজ সো লাউড! রীনা বললে।

—না না, এটা তুমি অন্যায় করছো। সে একটা নামজাদা খেলোয়াড়, ব্রাইট ছেলে। আই হেট দোজ বেঙ্গলী বাস্টার্ডস্—ঐ সব মিনমিনে থটফুল টাইপ। ওগুলো শেষ পর্যন্ত কেরানী হয়ে কলম পেষে, আর রাস্তায় গিয়ে লাল ঝাণ্ডা তোলে। রিন্, আমি তোমাকে আগে বলি নি। তুমি ওর প্রতি কোল্ড হয়ে গেলে বলেই ওর শেষ পর্যন্ত এই দশা হল। তোমরা মেয়েরা বাবা সত্যি! ফ্রেইন্টি দাই নেম্ ইজ উওম্যান্।

—ওটা একদম বাজে কথা দাদা, তুমি নিজেই জানো। টুনিদি না থাকলে তুমি কোথায় যেতে।

—এই তো, মেয়েরা বড্ড পার্সোনাল কথা বলতে ভালবাসে। তুমি হলে ফ্রান্সফেরতা বাঙালী মহিলা শিল্পী, তুমিও এইসব পার্সোনাল কথা বলছো!'

—ফ্রান্স থেকে ফিরে তো পুরুষ বনে যাই নি। চাপা হাসি খেলে রীনার ঠোঁটে।

এতক্ষণ চুপচাপ চোঙা ভাইবোনের কথাবার্তা শুনছিল। এ জগতে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, শুধু সামাজিক নয়, এখানে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব আছে। বিশেষ করে অমলার পরিবেশের সম্পূর্ণ বিপরীত বিদেশফেরতা মহিলা আর্টিস্ট, রীনা গাঙুলীর জগৎ। কিন্তু সেই কারণেই বোধহয় কিছুটা অস্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করে চোঙা। স্বরূপ তার কলেজের সহপাঠী। পড়ন্ত সলিসিটার বংশের ছেলে। কিন্তু পড়তে পড়তেও ছাত্রাবস্থায় শুনেছিল কলকাতার সম্ভ্রান্ত এলাকায় খান তিনেক বাড়ি তাদের আটকে আছে। তারা দুই ভাই বোন। অনায়াসে রীনাকে সম্পত্তির অন্যতম উত্তরাধিকারিণী ভাবা যেতে পারে। তাছাড়া সম্পত্তির ব্যাপারে যদি খ্যাঁচও থাকে, শরিকের গণ্ডগোলে তবু হার্ট স্পেশালিস্ট স্বরূপের বাপ তো এখন একটা গোল্ডমাইন। স্বরূপের বাবা নবীনের গাঙুলি গত আট-দশ বছরে প্রবল পশার গড়ে তুলেছেন। তাঁর চৌরঙ্গীর চেম্বারে মারোয়াড়ি মক্কেলদের গাড়ির হরদম আনাগোনা।

আগে দুচার বার গিয়েছে বটে স্বরূপের বাড়ি, কিন্তু তার বোনের সঙ্গে সামান্য মুখচেনা ছাড়া

পরিচয় এগোয় নি। সম্প্রতি রীনা ফ্রান্স থেকে ফিরে তার প্রথম একজিবিশান করেছে। কলা-সমালোচকরা কেউ কেউ খুব উচ্ছ্বাস করেছেন, কেউ কেউ পাত্তা দেন নি। তারপর চোভার উৎসাহ দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে 'ফুরি'তে স্বরূপের এই ব্যবস্থা। তার বোনের খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের একটু দুর্ভাবনাও বেড়েছে। রীনা ব্যাপারটা বড্ড সিরিয়াসলি নিচ্ছে বলেই স্বরূপের দুর্ভাবনা।

রীনাই হঠাৎ মুখ তুলে বললে,—কী? আপনি যে একদম চুপচাপ।

—কি বলব! একেবারে আনকালচার্ড লোক। আর্টফার্ট কিচ্ছু বুঝি না।

—আর্টের গল্প করতে আমারও ভাল লাগে না, জানেন? স্টুডিওতে যতক্ষণ থাকি তখন ওসব নিয়ে খালি ভাবি। বেরিয়ে এসে একদম ভুলে যাই। ফ্রান্সে আমার এক সঙ্গী জুটেছিল পার্স বলে। রঙে দারুণ হাত। লোকটা বুড়ো, একখানা ক্যানভাসও বিক্রি হয় না। আমরা দুজনে হাঁটতাম, খালি হাঁটতাম। এত ভাল লাগত।

চোভার দিকে চেয়ে চেয়ে যখন রীনা কথাগুলো বলে তখন এক ঠাণ্ডা দীপ্তিতে তার চোখ দুটো ভরে থাকে। মেয়েটি কি তার সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসুক? এটা কি এমন পরিস্থিতি যাতে আরও এগোন যেতে পারে? এই যে সব হাতের পাঁচ প্রশ্ন কোন মহিলার সঙ্গে আলাপ হলেই যা জেগে উঠত তা এখন চাপা পড়ে।

—কলকাতায় কোথায় হাঁটবেন? একেবারে কিলবিল করছে মানুষ পোকার মতো। তার ওপর ভিখিরি, কাটা ফুটপাত, ময়লা। ওসব ফ্রান্সেই চলে।

—আমি কিন্তু এখানে এসেও হাঁটছি। এই ধরুন, বিকেল-বিকেলে যখন রোদ থাকে না। অফিসগুলো ছুটি হবার ঠিক আগে।

যদিও হাই পাচ্ছিল এই সব ছেলেমানুষি কথা শুনে, তবু উৎসাহ দেখিয়ে চোভা বললে,—আমাকেও নিন না আপনার সঙ্গে। একটু ভুঁড়ি হচ্ছে না হেঁটে হেঁটে।

খুব হাল্কা কুঁচকানি মেয়েটার ভুরুতে জাগে। মৃদু হেসে বলে,—আপনার আর্টে উৎসাহ নেই। আমি পলিটিক্স একদম বুঝি না। আমার বাবা পলিটিক্সে খুব ইণ্টারেস্টেড। দাদার সঙ্গে তর্ক করেন। দাদা তর্কের খাতিরে সব রকম সাজতে পারে।

স্বরূপ বললে,—পারব না কেন? আমি সব সময় বলি, জিভে কোন হাড় নেই। একটু এদিকে ঘোরালে কমিউনিস্ট, একটু ওদিকে ঘোরালে ক্যাপিট্যালিস্ট। তাই না ব্রাদার? স্বরূপ তার জলজলে টাকটা নাড়ায় চোভার দিকে।

মনে মনে চোভার কথাটা পছন্দ। স্বরূপের সঙ্গে একমত। কিন্তু বিশেষ রাজনৈতিক সংবাদদাতা সে, আর পাঁচ-ছ বছর পর রাজধানীর ইন্দ্রদের সঙ্গে রাজনৈতিক খেলায় সেও প্রকারান্তরে যোগ দিয়েছে—এরকম একটা স্বপ্ন যখন খেলছে মনের ভেতর তখন ব্যাপারটাকে এত খেলো করে দিতে তার মন ওঠে না। রাজনীতিকে যারা সহজে সরল চেহারায় চিহ্নিত করতে চায় চোভা তাদের শত্রু বলে ভাবে। রাজনীতির চেহারা যত ঘোরাল পেঁচালো দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মের মতো বা মহাভারতের ধর্মের মতো সূক্ষ্মবস্তু হিসেবে চিত্রিত করা যায় ততই তার পক্ষে মঙ্গল।

মুখ গম্ভীর করে বলে,—যতখানি সোজা ভাবছো ব্রাদার ততখানি নয়।

—নাউ দ্য এক্সপার্ট স্পিক্স্। স্বরূপ বললে।

—ঠাট্টা করছো কর। কিন্তু রাজনীতি একটা চেঞ্জিং প্রোসেস। শুধু সাদাকালোতে ভাগ করা যায় না। যেমন ধরো কমিউনিস্টরা বলে, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু ক্যাম্পস্। ওয়াল স্ট্রীটও তাই বলে। কিন্তু রিয়ালিটি—টা আরও কমপ্লেক্স। যেখানে ক্যাম্প উইদিন ক্যাম্প।

—ব্রাভো! তুই খুব শেপ করবি রে!

রীনা বললে, পার্স মার্কিদের দলে ছিল। অ্যান্টিফ্যাসিস্ট লড়াই করেছিল। আর্টের ব্যাপারেও ভীষণ সীরিয়াস। কোনো কম্প্রমাইজ করেনি।

—ফ্রান্স আর ভারতবর্ষ এক জিনিস না। অসহিষ্ণু হয়ে চোভা বলে।

—আমিও রিনকে তাই বলি, স্বরূপ বললে।

—পৃথিবীটা সব জায়গায় একই রকম। কোথাও ঠাণ্ডা, কোথাও বা গরম।

—মোটেই নয়, মোটেই নয়, কোথাও অ্যাডভান্সড কোথাও ব্যাকওয়ার্ড।

—দ্যাটস্ রাইট! চোভার কথায় উৎসাহের সঙ্গে সায় দেয় স্বরূপ।

—আমি তো বললাম আমি পলিটিক্স বুঝি না, রীনা বললে।

—সত্যিই বোঝেন না, যেমন আমি আর্ট একদম বুঝি না।

রীনা ঘাড় নাড়িয়ে বললে, কিন্তু আমি এটুকু বুঝি সমস্ত দেশের মানুষ আসলে একরকম, শান্তিতে নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে চায়। পার্স একটা কবিতার লাইন প্রায়ই আওড়াত যার মানে হল—সীমানায় সীমানায় বিরোধ কিন্তু আকাশটা এক।

স্বরূপ অপ্রস্তুত হাসি হাসে। চোভা আর রীনার দেখাসাক্ষাৎটা যে তার বোনের একগুঁয়েমির জন্যে মাঠে মারা যেতে বসেছে তা স্পষ্ট টের পায়। তার বোন সম্পর্কে সে মাঝে মাঝে নিজেকেই দোষী করে। ছেলেবেলায় খাতায় দেয়ালে যেখানে সেখানে রীনা যখন তার অঙ্কনবিদ্যার পারদর্শিতা প্রমাণ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল তখন থেকেই স্বরূপ তাকে ও ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। আর স্কুলের প্রথম কয়েক বছরও ব্যাপারটাতে খেলা খেলা ভাব ছিল। কিন্তু স্বরূপের সন্দেহ শুধু বুড়ো পার্স নয়, কিছু ছোকরা বাঙালী শিল্পীর সাহচর্য তার মাথাটা খেয়েছে, ফ্রান্স থেকে ফেরার পর রীনা প্রায় একটা পারিবারিক সমস্যা। ঠিক এই কারণেই তাদের পারিবারিক স্ট্যাণ্ডার্ডে না পড়লেও চোভার সঙ্গে তার বোনকে ভিড়াতে চায় স্বরূপ। আরও কয়েক জায়গায় খোঁজ নিয়ে সে জেনেছে চোভা উঠছে, তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়, কাজেই তারা ঠিক একই রকম বাড়ি থেকে না এলেও ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে। আজ সন্ধ্যার এই সাক্ষাৎকারে মনে মনে চোভাকে স্বরূপ যত তারিফ করে তত বিগড়ে যায় তার বোনের ওপর।

এতক্ষণে কিন্তু চোভা তার নিজের বিষয়বস্তু খুঁজে পেয়েছে। মেয়েটি ভাল কিন্তু অপরিণত-মস্তিষ্ক—এইরকম এক চিন্তা মনে খেলে যাওয়ায় সে আনন্দ পায়। আস্তে আস্তে হেসে বলে,—আপনার বন্ধু হয়ত একজন মস্ত শিল্পী, কিন্তু তিনি রাজনীতি কিছু বোঝেন না।

রীনা জেদী ঘাড়খানা তুলে বলে,—পার্স একজন মস্ত মানুষ।

চোভা হেসে বলে,—মনুষ্যত্ব নিয়ে তো কোন প্রশ্ন নয়। আপনাদের সাহিত্যে শিল্পে বলে না,

মনুষ্যত্ব শয়তানেরও আছে? ওসব কথা আনলেই দেখবেন শেষ পর্যন্ত কোন আলোচনা করা যায় না, শুধু ভাবাবেগে ভেসে যেতে হয়।

চোঙার চিন্তাশক্তি সম্পর্কে তার বন্ধুর এতদিন খুব একটা উঁচু ধারণা ছিল না। বস্তুত বড় ঘরের ছেলে এবং বিলেতফেরতা এই দুটো প্রাথমিক শর্ত কারও ক্ষেত্রে পালিত না হলে তার চিন্তাশক্তি সম্পর্কে তার কোন উৎসাহ জাগে না। কিন্তু চোঙার কথায় সে একটু অবাকই হয়। চোঙা এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং স্বরূপের বিষয়ী বুদ্ধি এটুকু আবিষ্কার করে যে এই গভীর আত্মবিশ্বাস যে কোন বিজনেস ফার্মের পক্ষে তা খবরের কাগজ সিমেন্ট অথবা ইলেকট্রিক বাল্‌বের ফার্ম হোক,এক অত্যাবশ্যক মূলধন যদি এই ধরনের ব্যক্তিত্ব এবং এস্টাব্লিশমেন্টের মাঝখানে খাঁচ না থাকে।

রীনা কিছু বলে না। কিন্তু সে এমন মাথা নীচু করে তার কেয়ারিকরা নখগুলো নিরীক্ষণ করতে থাকে যে স্পষ্টতই চোঙার বিশ্লেষণশক্তি তারিফ করে না বোঝা যায়।

—আমার ছোট ভাইটাও কমিউনিস্ট, জানেন?

—রীনা চোখ তুলে তাকায়।

—হ্যাঁ! আমি মাকে বলি, ধরে নাও না ও পাগল হয়ে গেছে। ভাল পড়ুয়া ছেলে, কবিতা লিখত, চলল জেলের তালা ভাঙতে।

—তাই নাকি? রীনা কৌতূহলী হয়ে তাকায়।

—গত একবছর কলকাতা শহরে কত মারপিটদাঙা হচ্ছে—সবগুলোর মধ্যে আছে সে। একবার হাজত বাসও করে এল। ভেবে দেখুন, আমাদের বাড়িতে, বাবা হোম ডিপার্টমেন্টের···ভেবে দেখুন। কিন্তু যেটা সবচেয়ে ফ্যানটাস্টিক সেটা জানেন, আমার ভাইও ঐ আপনার ফরাসী বন্ধু পার্স না মার্স তার মতো কথা বলে। অদ্ভুত সব কবিতায় কথা, শুনতে ভাল লাগে। কিন্তু ওদের কমরেডরা কেউ পুছবে না ওসব কথা!

রীনা চেয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে চোঙার দিকে, আবার মৃদু কৌতূহলের দীপ্তি তার চোখে খেলে।

চোঙা সিগারেট ধরায়। বুদ্ধিতৃপ্ত মুখখানা ঝলমল করে তার। এবার শ্রোতাদের দিকে একবার দেখে নিয়ে বলতে থাকে,—রাজনীতির একটা নির্দিষ্ট লজিক আছে। কমিউনিস্টরা সেটা মানে, অ্যান্টিকমিউনিস্টরাও মানে—যারা রাজনীতি করে তাদের কথা বলছি। তারা দুজনেই দুজনকে ধ্বংস করতে চায়। মাঝখানে থাকে এক ধরনের লোক—আপনার বন্ধু, আমার ভাই—তারা নিজেদের টার্মসে রাজনীতি দেখে, শেষ পর্যন্ত তাই মরে।

এ বিশ্লেষণ স্বরূপেরও মনঃপূত হয়। সে ভেতরে ভেতরে কৃতজ্ঞতাবোধ করে তার বন্ধুর প্রতি। এ ধরনের কথাবার্তায় হয়ত রীনা তার মেজাজের স্বাভাবিক কক্ষপথ আবার ফিরে পেতে পারে এমন বিশ্বাসও জাগে।

রীনা হঠাৎ বললে,—কি আপনার লজিক?

—আমার? চোঙা হেসে ফেলে। স্বরূপ ভাবছিল চোঙা বলবে তার অপরচুনিস্টের লজিক, অন্তত সে নিজেও তাই বলত। কিন্তু চোঙা হঠাৎ খুব ভাবগম্ভীর মুখ করে বলে,—আমরা সবে স্বাধীন হয়েছি। আমাদের অনেক কিছু করবার আছে। গোটা দেশটা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশানের

পথে নিয়ে যেতে হবে। বিপ্লব বিপ্লব বলে চেঁচালে তা হবে না। তার জন্যে কাজ করতে হবে। আমার লজিক সেই প্রোসেসটা জোরাল করা। একটু থেমে রীনার দিকে চেয়ে বললে,—জানি না ঠিক বোঝাতে পারলাম কি না।

স্বরূপ উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল,—গ্রেট গ্রেট! চোঙা, ইউ আর গ্রেট!

ছয়

মাস দুয়েক পর ভ্যাপসা গরমের এক দুপুরে ভিড়ে টাপুর টুপুর বাসখানা হাওড়া ময়দান ছাড়াতে না ছাড়াতেই মিছিলে আটকা পড়ে। হাওড়ার কলগুলো থেকে পিলপিল করে লোক বেরিয়ে আসছে ফ্ল্যাগফেস্টুন নিয়ে কোন শ্রমিক দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে। ডালহৌসী স্কোয়ারমুখী সে মিছিলে বাসটা ঠায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে আর যাত্রীরা সেদ্ধ হয় পচা গরমে। কেউ তর্ক করে, কেউ আষাঢ়ে গল্প ফাঁদে, শার্ট গেঞ্জি ব্লাউজ যত লেপ্টে যেতে থাকে ঘামে শরীরের সঙ্গে ততো চুপ মেরে যায়। তারপর অবিশ্বাস্য ঘটনার মতো হঠাৎ চলতে সুরু করে বাসটা ভিড়ের ভারে বেঁকে হেলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে।

রীনা স্টপটায় নেমেই ব্যাগ হাতড়ায় রুমালের জন্যে। খোলা ড্রেনের দুধার দিয়ে জমা পচা গলা পাঁক রাস্তার ধারে থরে থরে সাজানো। স্টপের উল্টো দিকেই ছ্যাংলাপড়া একটা গলি। দুটো মানুষ পাশাপাশি কোনরকমে যেতে পারে এমন রাস্তা, তারও মাঝে মাঝে জমা করা উনুনের ছাই, মাছের আঁশ, মিঠা কুমড়োর বুকো আর বিচি। বাড়ির পাঁচিলটার গায়েই শিবমন্দির। মাথার ওপর ফুলে ভর্তি কাঁঠালিচাঁপা গাছটা থেকে মৃদু গন্ধ আসে। রুমালটা তার ফরাসী হ্যাণ্ডব্যাগে রেখে রীনা রঙজ্বলা উঁচু কাঠের ভেজানো দরজাটা ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢোকে।

একটা মস্ত পুরনো গোলাপি বাড়ির এক অংশ। কর্তাদের আমলে বোধহয় সামনের ঘরখানা বৈঠকখানা ছিল। ঘরভর্তি ছবি। দেয়ালে মুখ উপুড় করা ক্যানভাসের গাদা। চৌকির নীচে মেঝেতে সর্বত্র ছবি। সবই উল্টে রাখা—খালি ইজেলে বসানো ছবিখানা ছাড়া। একটা চ্যাঙা রোগা পাজামা গেঞ্জিপরা লোক ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ করছে। রীনা সেদিকে যায় না। একটা টিপয়ের ওপর টেবিলফ্যানের সামনে ঘামে জবজবে পিঠ পেতে হাওয়া খায়।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। লোকটার ঘাড়ের পাশ দিয়ে রীনা চেয়ে থাকে প্রায়সমাপ্ত ক্যানভাসটার দিকে। নীল রঙের কাজ, নীলের মাঝখানেই ফিকে হাল্কা জমাট নীল! কখনো হলুদে। কখনো কমলায়, কখনো আগুন লালে সমস্ত ক্যানভাসটা এক ঠাণ্ডা আলোয় আলো করে রেখেছে। রীনা সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—এসেছো? লোকটা পেছনে না ফিরেই বললে।

—হ্যাঁ।

প্রায় আধঘণ্টা চুপ করে কেটে যায়। চৌকিটার এককোণে হাঁটুর ওপর মুখ রেখে রীনা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে আর সুহাস যেন ঘুমের ঘোরে রঙের ওপর রঙ চড়ায়। মস্ত বড় ক্যানভাস, প্রায় ছমাস আগে শুরু করে ফেলে রেখেছিল, আবার শুরু করেছে। আর সে কাজ করে

একটা জন্তুর মতো এনার্জিতে। এই রকম প্রায় আট-দশ দিন সমানে চলে। রীনা জানে এই প্রলম্বিত তন্ময়তার মাঝখানে তার কোন স্থান নেই। অথচ সে আজ এসেছে, অনেক কিছু বলতে। তার সমস্ত পারিবারিক চাপ সে একা একা মুখ বুঁজে সয়ে এসেছে। আর পারছে না, এখন এই চাপের খানিকটা তার সবচেয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে না নিলে পারছে না।

—সুহাস! চাপা গলায় রীনা ডাকে। জানলার বাইরে কাঁঠালিচাঁপার গাছ থেকে হঠাৎ একটা টিয়া টি-টি-টি শব্দে উড়ে যায়। সুহাস একবার সেদিকে চেয়ে আবার রঙ চাপায়। রীনা লক্ষ করে অনেকক্ষণ থেকে সে নীলের মাঝখানে হলুদ ফোটাতে চেষ্টা করছে। আবার সে তন্ময় হয়ে আঙুল নাড়াচাড়া করে। ঘামে সমস্ত পিঠটা ভিজে গেছে। নীল হলুদ, হলুদ নীল, এবারে কি ক্রিম্‌সন্? মাঝখানে কালো কালো কিসের ইশারা? আঙুলের না বাঁকানো গরাদের। রীনার হঠাৎ মনে পড়ে যায় সুহাসের একটা বক্তব্য—আমি গল্প চাই না, আমি রং চাই, লাইন চাই।

—কেমন হচ্ছে? সুহাস হঠাৎ ঘুমের মধ্যে থেকে জেগে উঠে বলল।

রীনা চুপ করে থাকে। ঘরের এক কোণে একটা বিরাট ক্যানভাসের দিকে চেয়ে বললে,—এটা এখানে পড়ে আছে কেন?

—ওখানেই থাকবে।

—কেন? পয়সাকড়ি দেয় নি? ক্লাটারব্রুক তো ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছিল!

এতক্ষণে সুহাস ফেরে। তুলিটা রেখে হাতের তেলোতে তেলো ঘসে। মস্ত বড় মাথাভর্তি কালো চুল গালভর্তি কালো চাপা দাড়ির মধ্যে চোখ দুটো জল জল করে। ক্যানভাসের চেয়ারখানায় গা এলিয়ে দিয়ে বসে চোখ বোঁজে। রীনা টের পায় রাত্তিরের কাজের জন্যে সুহাস তৈরী হচ্ছে। তার আঁকার ব্যাপারটা বানভাকা নদীর মতো এসে তার দিন রাত তোলপাড় করে দিয়ে তাকে দিন দশ-বারোর মধ্যে চড়ায় ফেলে দিয়ে যাবে। তদ্দিন অন্তত রীনা তার মনের মধ্যে নেই।

—তুমি নিশ্চয় ভাবছো কদ্দিন এরকম চলবে? চেহারায় একেবারে বিপরীত গলা সুহাসের। সুরেলা তীক্ষ্ণ চিন্‌চিনে গলা। নিজের মনে বললে,—এখন অনেকটা ধাতস্থ হয়েছি। এখন বোধহয় ভেতরে ভেতরে একটা রিসার্ভয়ার তৈরী করতে পারছি। এখন ঠিক করেছি পাগলের মতো আর কাজ করব না। রোজ কাজ করব।

—রাত জাগছো?

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে সুহাস। ঘরখানায় পায়চারি করতে করতে বলে,—ক্লাটারব্রুকের কথা বলছিলে না? আমি দিই নি। চারখানা ছবি—ঐ বড় দুটো, এইটা, আর ঐটা পছন্দ করেছিল। চারহাজার টাকার অর্ডার। দিলাম না।

আবার চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলে,—দিলাম না কেন? জলজলে চোখ মেলে তাকায় রীনার দিকে।—দিলাম না কেন তার মানে আমিরা ভিখিরি নয়, সেইজন্যে।

—তার মানে?

—লোকটার হঠাৎ ট্রান্সফার অর্ডার এল। লোকটা ছবি নিয়ে যাবে না দেশে সঙ্গে করে। তার চাকরবাকরদের দিয়ে যাচ্ছে শুনলাম। কি রকম আত্মসম্মানে লেগে গেল রীনা। ছবিগুলো

নিয়ে এলাম। আমার বন্ধুবান্ধবেরা কেউ কেউ নিন্দে করছে। তুমিও হয়তো করবে। কিন্তু পারলাম না।

—অনেকগুলো টাকা! রীনার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

—হ্যাঁ, আর অনেকখানি সম্মান! তারপর হঠাৎ মুখ ফেরায় রীনার দিকে। কপালে গোঁফের ওপর ঘামের বিন্দু এখনও জমে আছে। তীক্ষ্ণ গলায় বললে,—তুমি আমার কাছে আসো কেন বল তো রীনা? কেন আসো? যদি আমাকে না বোঝ তাহলে কেন আসো? আমি তো বলেছি তোমাকে, এই পচা গলির বাসিন্দে আমি, এইখানেই আমার স্বর্গমর্ত, হ্যাঁ এইখানেই আমার সব। আমার কোন প্রাইজ চাই না, ককটেল পার্টিতে গিয়ে তারিফ কুড়োতে চাই না, কল্‌লেটগুলোর দাক্ষিণ্য চাই না, চাই না বিখ্যাত কাগজগুলোর বিখ্যাত সমালোচকদের পিঠচাপড়ানি। চাই না, আমি কাজ করতে চাই। হ্যাঁ, আমি রেলের কেরানী হয়ে দশটা-পাঁচটা করব। আর ফিরে রাত জেগে আমার স্বপ্নের রাজত্ব তৈরী করব। তুমি পছন্দ করছো না? কিছু এসে যায় না রীনা, কিছু এসে যায় না। কিছুতেই কিছু এসে যায় না। আমি কাজ করব।

বাইরে বিকেল পড়ে আসছে। গলির মধ্যে থেকে একটা ফিরিওয়ালার হাঁক আসে, চাই আলুর দম।

—আমি আমি কোন এস্‌কেপ চাই না রীনা, বিশ্বেস করো। সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ—একথাগুলো তুমি একবার বলেছিলে, মনে আছে? তোমার দিক থেকে ঠিকই বলছো। কিন্তু তার মানে ছবি আঁকতে আর একবার পৃথিবীতে আসতে হবে। আমার এই জন্মটা কি খারাপ বলো? আর যদি আমার পরিবেশ বেশ স্বাভাবিক সুস্থ থাকতো তাহলে আমি একটা বড় চাকরি করতাম। আর্টলাভার হতাম, তোমাকে বিয়ে করে তোফা থাকতাম। তুমি—তুমি ঐ যে খবরের কাগজের যে লোকটা এসেছে ওকেই বিয়ে করো। হি উইল মেক্ ইউ হ্যাপি।

—ডোন্ট বি ক্রুয়েল।

রীনার অনুরোধ সুহাসের কানে পৌঁছয় না। আবার উঠে পায়চারি করে। এবার চৌকিতে রীনার পাশে বসে বলতে আরম্ভ করে—কাল রাত্তিরে একটায় বাড়ি ফিরে সটান ঘুমিয়ে পড়েছি। বোধহয় রাত দুটোও হবনি। হঠাৎ মা হাউমাউ করে উঠে পড়লেন। কতগুলো আরশোলা ফরফর করে ওড়ে মাঝে মাঝে। খড়খড়ে বাড়ি। অজস্র ফুটোফাটা। মার মুখে পড়েছিল বোধহয়। উঠে চেঁচিয়ে কাঁদেন আর বিশ্রী ভাষায় আমাকে গাল পাড়তে থাকেন। বাইরে রকে গিয়ে মাদুর পেতে শুলাম, কিন্তু ড্রেন থেকে এমন মশার ঝাঁক আসছিল—ভাল করে ঘুম হল না। ভোরে পাঁড়ের দোকানে গিয়ে চা আর বেগুনি। আঃ, কি ভাল লাগল রীনা সেই ঠেলাওয়ালাদের ভিড়ে বসে চা খেতে! হাতের মুঠোয় জীবনটা আবার ফিরে পেলাম!

এক ঝলকে সুহাসদের বাড়িটা রীনার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। খরখরে ক্ষয়া সুহাসের মায়ের কথাবার্তা শুনে রীনা এক চোখে হেসেছিল আর এক চোখে কেঁদেছিল। বলতে গেলে একখানাই ঘর, তার সঙ্গে ফালি বারান্দা, সেখানে তোলা উনুনে রান্নার ব্যবস্থা। উঠোনের কোণে মরচেপচা কয়োগেটের টিনের দরজা সাঁটা বাথরুম, তার বাইরে পেঁচকাটা কল থেকে অনবরত জল

পড়ার শব্দ। এক ঘরে মা, বড় ছেলে সুহাস, সুহাসের বোন আর ইন্টারমেডিয়েট ফেল ছোটভাই নিয়ে সংসারযাত্রা। তবে রীনার বিদেশে থাকাকালীন এক ঘটনায় কিছুটা স্থানসংকুলান হয়েছে। মাস দুয়েক হল দুটো পেট্রোলপাম্প আর লরীর মালিক আগরওয়ালার ছোট ছেলের সঙ্গে সুহাসের বোন নিরুদ্দেশ। সুহাস কিছু হদিস করতে পারে নি এতদিনেও।

হঠাৎ অপরিসীম ক্লান্তিতে রীনা হাই তোলে। ক্লান্তিটা শুধু শারীরিক নয়, মনের দিক থেকেও এক অবসাদ। এখানে কি সব সময় যুদ্ধ করতে হবে? ভালবাসতে গেলেও লড়াই, আর্টের ক্ষেত্রেও লড়াই। সবাই কি সুহাস হতে পারে? আর যে পারে না তার জন্যে সুহাসের কোন ক্ষমা নেই।

—কফি খাবে? একটু কফি যাও। তক্তাপোশের নীচ থেকে কেটলি বার করে কুঁজো থেকে জল ভরে। হিটারে জল বসিয়ে দিয়ে বসে। রীনা কফির টিন বার করে।

—ফুরিয়ে গেছে? তাহলে থাক।

—না না, আছে।

—আলো জেলো না, এই যে চিনি।

দুজনে অন্ধকারে চুপচাপ কফি পান করে।

—এই অন্ধকারে বসে থাকতে বেশ লাগে। এই অন্ধকারে অনেক কথা মনে পড়ে যায় না? কত সন্ধে কত সকাল একসঙ্গে কাটিয়েছি।

—আরও কাটাব সুহাস।

—তোমার দুঃসাহস বড্ড বেশী।

সেই অন্ধকারের ফ্রেমে আঁটা সন্ধের শেষ আলোয় আলোকিত জানলাটার দিকে চেয়ে চেয়ে আস্তে আস্তে বলে রীনা,—আমি নিজের কাছে এতখানি হেরে যেতে চাই না সুহাস। তোমাকে যদি ছেড়ে চলে যাই তাহলে আমার বড্ড হার হয়ে যাবে যে।

—জিদের কথা বলছো?

—তাই বল। বাবা চিরকাল বলে আসছেন টাকা দিয়ে সব কিছু করা যায়। সব কিছু পাওয়া যায়। মাকেও তাই বলতেন। দাদা ঠিক মুখে ওকথা বলে না কিন্তু মনে মনে বলে। আর ওরা দুজনেই প্রাণপণ চায় আমি ওদের মতো ভাবি। দাদা বলতে সুরু করেছে আমি যেন ফ্যামিলির প্রেস্টিজটা ভুলে না যাই।

—ওফেলিয়া?

রীনা সুহাসের পিঠে মাথা রেখে আস্তে আস্তে বলে,—আমি ওফেলিয়া হতে চাই না সুহাস, বিশ্বাস করো। কিন্তু আমার ভীষণ সাহসের অভাব হচ্ছে। তোমাকে এক দারুণ সুন্দর ডন কুইক্সোটের মতো লাগে। আর কেউ হলে এতদিনে কোথায় তলিয়ে যেত। কিন্তু তুমি বেড়ে চলেছো। আমি তো জানি আমার এলেম কতখানি। আমি পিকাসো মাতিস কপি করতে পারি, তাই করছি। আর পাঁচটা লোকও তাই করছে, কেউ কেউ এরই মধ্যে পটের কায়দা দেখাচ্ছে, কোকশিল্প করছে। আর তুমি এই খোলা ড্রেনের পাশে রক্তের রাঙ্গা হয়ে বসে আছো। আমি পারি না, কিন্তু আমি জানি, আমি নিজে পারি না। আশেপাশে একটা লোক নেই যে তোমার

মতো অয়েল পেণ্ট মানাতে পারে। তোমাকে শুধু ভালোবাসি না সুহাস, তোমাকে বড্ড ভয় করি।

আস্তে আস্তে ঘাড়ের পাশ থেকে রীনার হাত দুখানা সরিয়ে নেয় সুহাস। একটু সরে টান হয়ে বসে। অন্ধকারে চাপা গর্জনের মতো লাগে তার গলার আওয়াজ।—প্লিজ, রীনা, প্লিজ! তোমাদের প্রশংসার ধ্বসে চাপা দিয়ে আমাকে মেরে ফেলো না। যদি আমার সত্যিই বন্ধু হও, আমাকে কাজ করতে দাও। আমি কোন রাগ করে বলছি না, আমাকে বুঝতে চেষ্টা করো। আমি তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারব না, তুমিও আমাকে কিছু সাহায্য করতে পারবে না। এটা শুধু ভালবাসার ব্যাপার কী, এটা···এটা···এটা কী বলব? এটা একটা ইন্টারেস্টের ব্যাপার যা বছরের পর বছর ধরে আমাদের সমস্ত বুদ্ধি হৃদয়ের শক্তিকে টেনে রাখে, আমাদের আত্মা হতে দেয় না। আমি তোমার বাড়ি, তোমার ড্রেসিং গাউনপরা বাবা, অজস্র বাঘা বাঘা চাকুরে আত্মীয়স্বজন—এদের সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে পারব না। জীবনটা বড্ড ছোট্ট রীনা, বড্ড ছোট্ট। মানুষের এনার্জি বড্ড কম। আর তার সামনে চ্যালেঞ্জ এত বেশী। আমি আমার সময় নষ্ট করতে পারব না।

—আমি জানতাম, তুমি তাই বলবে। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখো। আমি···আমি···রাজী আছি। আমি···এই খোলা ড্রেন···তারপর সমস্ত মুখে একটা ভয় ও উদ্বেগ নিয়ে বললে,—আর আর মাঝরাতের আরশোলা। মেনে নিচ্ছি। তাছাড়া, আমিও কমার্শিয়াল কাজ নেব। আমি বলছি আমি ঠিক পারব।

অন্য দিক থেকে কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর সুহাস আস্তে আস্তে বলে,— আমি ডুবব, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ডোবাব। এবারে অন্যদিক থেকে নৈস্তব্ধ্য। ঘাড় না ফিরিয়ে সুহাস বললে, —কাঁদছো নাকি?

পরিষ্কার আবেগহীন গলায় রীনা বললে,—না।

—কেঁদো না। আমাদের ব্যাপারটা এমন যে কেঁদে ম্যানেজ করা যায় না। নইলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও কাঁদতাম।

—তুমি যা বলছো হয়তো তাই ঠিক।

—আমি কোন রূপকথা বিশ্বাস করি না রীনা। রূপকথা বাদ দিয়েই জীবনটা দেখা ভালো।

সাত

প্রায় তিনমাস পর সেই প্রতীক্ষিত দিন এল। মাঝখানে অল ইণ্ডিয়া কার্ডিয়াক কনফারেন্সের তাইস প্রেসিডেন্টরূপে ব্যাঙ্গালোরে যেতে হয়েছিল কলকাতার বিখ্যাত হার্ট স্পেশালিস্ট এন. গাঙ্গুলিকে। কিন্তু ঠিক সেজন্যে নয়। স্বরূপের খোঁচানির কোন ত্রুটি ছিল না, কিন্তু খবরের কাগজের লোকজন, সে যে রকমই কেউকেটা হোক না কেন, তাঁর সঙ্গে তাঁদের পরিবারের স্ট্যাণ্ডার্ড মেলে না একথাটা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। বুলা না হয় বকে গেছে, কিন্তু আরও তো ছেলে আছে পৃথিবীতে যাকে তিনি জামাই বলে মেনে নিতে পারেন। শেষ পর্যন্ত স্বরূপের জেদে তিনি রাজী হলেন।

ক্যালকাটা ক্লাবের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় দেখা হল শীতের সন্ধ্যায় নীরেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে। ছোটোখাটো শরীর, মস্ত টাক, কিন্তু বেশ কর্মঠ ব্যক্তিত্ব—এক ঝলক চাহনিতেই ধরা পড়ে। বেশ

সৌখীন ভদ্রলোক, দামী ধুসর সার্জের স্যুট, সাদা টাই, ওডিকোলনের ফুরফুরে গন্ধ।

বারান্দায় ঢুকেই চোঙার দিকে এক নজর তাকিয়েই তার পরিচয়দানের অপেক্ষা না করেই গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠলেন,— আ, আই হ্যাভ হার্ড এবাউট ইউ। স্বরূপের দিকে বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে বললেন,—হি থিংক্স হেল অফ ইউ।

চোঙা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হল। অ্যাকসেন্ট যতখানি জবরদস্ত ভেবেছিল ততখানি নয়।

স্কচ্ হুইস্কি অর্ডার দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন,—আই অলওয়েজ প্রেফার স্ট্যাণ্ডার্ড ইন এভরিথিং। পিতার সম্মানার্থে স্বরূপ হু'গেলাস টোমাটো স্যুপ আনালে।

ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে চোঙার আপাদমস্তক দেখে দিয়ে বললেন,—দেশের যা অবস্থা! উই আর পাসিং থ্রু এ ক্রিটিকাল টাইম।

চোঙা আস্তে আস্তে বললে,—প্ল্যানগুলো চালু হলে খানিকটা ইম্প্রুভমেণ্ট আশা করা যায়।

ডোণ্ট টক রট, ভদ্রলোক আবার চেঁচিয়ে উঠলেন।—ঐ সব সোশ্যালিস্ট প্ল্যানিং। সোনার পাথর বাটি। আই টেল ইউ, প্রাইভেট ক্যাপিটেলের ইনিশিয়টিভ না থাকলে কোথাও কিছু হয় নি, হবে না।

—তা অবশ্য, চোঙা ঘাড় নাড়ায়। একটু অস্বোয়াস্তিও হয়। হঠাৎ তার মনের মধ্যে উমাচরণের মুখখানা খেলে যায়। উমাচরণকে সে ঘেন্না করে কিন্তু সে ঘেন্নাটা পরিষ্কার জানিয়ে দিতে পারত। এমন কি তার বাপ ভবনাথকেও সে থোড়াই কেয়ার না করেও পারে। কিন্তু এই কর্মঠ পয়সাওয়ালা বৃদ্ধ কেবল সম্ভ্রমের দাবীর ভিত্তিতেই আলাপ চালাবে মনে হয়।

—বাবা ভীষণ পলিটিক্সে ইণ্টারেস্টেড! স্বরূপ বললে।

—রীনাও সেদিন বলছিল, চোঙা নীরেন গাঙ্গুলীর চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে বললে।

—ও! ইউ নো হার। গুড! একটু চুপ করে থেকে বললেন,— সি ইজ এ গুড গার্ল, অ্যাবসলিউটলি এ ওয়ান্। কিন্তু ভেরি মুডি!

—মেয়েরা একটু ঐরকমই হয়! চোঙা তার স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠল।

—দ্যাটস্ রাইট! দ্যাটস্ রাইট! মেয়েরা ঐ রকমই হয়। দ্যাটস্ এ ফাইন ডিগ্। অ্যাবসলিউটলি এ ওয়ান আই মাস্ট সে। ওয়েটার!

ভদ্রলোক হঠাৎ দাক্ষিণ্যের ভরা কোটালে ছল্‌ছল্ করে ওঠেন। ওয়েটার আসতেই ছেলেকে বলেন,—ডোণ্ট বি সিলি! হ্যাভ এ স্কচ্।

আধঘণ্টা আলাপের পর নীরেন গাঙ্গুলী আত্মকাহিনী বলতে শুরু করেন। বাবা সৎ লোক ছিলেন, তাঁর প্রকাণ্ড ভালমানুষেমির ফলে ঠাকুরদাদার ফার্ম ডুবতে বসল। বড়লোক হবার জন্যে গেলেন বক্স মাঠে। তাতে দুটো বাড়ি বিকিয়ে গেল। তাঁর দাদা কোনরকমে ফার্মটা ঠেকা দিয়ে রাখলেন। তারপর তাঁর ডাক্তারি জীবন। বিলেতে বড় বড় পেপার করেছেন। চোঙা ঠিক ধরতে পারলে না, বোধহয় এক নরউইজিয়ান ভদ্রলোকের নাম করলেন এমনভাবে যেমন লোকে লেনিন কিংবা অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের নাম করে। কিন্তু এহেন লোকের প্রশংসা পেয়েও দেশে এসে কিছুই করতে পারলেন না। তবে গীতার কর্মযোগে তিনি বিশ্বাস করতেন। ইউ নো উই কাম্ ফ্রম এ গ্রেট পণ্ডিতস্ ফ্যামিলি। মাই গ্রেট গ্র্যাণ্ডফাদার…

চোঙাও কিঞ্চিৎ বয়স্থ। বললে—হ্যাঁ, আপনাদের বেশ একটা ব্যালেন্স দেখছি। অ্যাণ্ড রীনা ইজ ওয়াণ্ডারফুল।

নীরেন গাঙ্গুলী হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন,—আই হেট্ পভার্টি ইউ নো। অ্যাণ্ড রীনা অলসো হেট্স্ ইট। সন্দেশে যদি মিষ্টি না থাকে, রসগোল্লায় যদি রস না থাকে, তাহলে মেয়েরা আপত্তি করবেই, অ্যাণ্ড দে আর রাইট! অ্যাবসোলিউটলি রাইট! ও সব আইডিয়ালিজমে চিড়ে ভেজে না।

—আই অ্যাম্ নট এ ম্যান অফ প্রপার্টি মিস্টার গাঙ্গুলী, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে চোঙা বললে।

—আই ডোণ্ট মিন্ দ্যাট।

—আমি জানি আপনি কী বলছেন। তবে খবরের কাগজে চাকুরি, আর ব্যারিস্টারি ডাক্তারি অনেক আলাদা।

—একজ্যাক্টলি, একজ্যাক্টলি।

—তবে আমাদের মধ্যে যাঁরা টপে আছেন সে পজিশানে বোধ হয় আপনার আপত্তি হবে না!

—গুড গুড! আমি স্বরূপকেও ঠিক এই কথাই বলছিলাম। এত তাড়াতাড়ির কী আছে! তোমাদের আলাপসালাপ চলুক। বাই দা বাই, ডাজ শি লাইক ইউ?

প্রশ্নটা যতই হাল্কাভাবে করা হোক, এক অনিশ্চিতির ছায়া সঙ্গে সঙ্গে চোঙার উদ্দীপ্ত মুখের ওপর নেমে আসে। এই অনিশ্চিতির লক্ষণ গাঙ্গুলী সাহেবের চোখ এড়িয়ে যায় না। ছেলেটাকে আর একবার ওজন করেন মনে মনে। পাত্র হিসেবে একেবারে ফ্যাল্‌না নয়, যদিও স্ট্যাণ্ডার্ডে ঘাটতি আছে। গাঢ় নেভি-ব্লু গলাবন্ধ ফুলহাতা সোয়েটার, চোঙার তীক্ষ্ণ সরু গোঁফ, সপ্রতিভ চাহনি, লম্বা একহারা চেহারা—সবটার মধ্যেই আকর্ষণের অভাব নেই।

সামান্য ইতস্তত করে একটু হেসে চোঙা বললে,

—মেয়েদের মন! জানেনই তো! তবে আপনারা কোওপারেট করলে………

—আই সি, আই সি! ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। ঘড়ি দেখে বললেন, অনেক রাত হয়ে গেল। তারপর তাঁর বড় গাড়িতে লিফট দেবার আহ্বান জানালেন। চোঙা হেসে জানালে তার গাড়ির ব্যবস্থা আছে। তারপর গাড়িবারান্দার নীচে অপেক্ষমান বাবা-ছেলেকে রেখে সে অফিসের গাড়িখানা নিয়ে সোঁ করে বেরিয়ে গেল।

সেদিকে চেয়ে চেয়ে মৃদু গলায় নীরেন গাঙ্গুলী বললেন,—ইয়েস, এ ব্রাইট বয়!

চোঙা সেদিন তার ইণ্টারভিউয়ে ভাল করলেও ডাক্তার সাহেবের মন থেকে খচখচানি গেল না। খবরের কাগজের যে ঐতিহ্য তার সঙ্গে তাঁর একমাত্র কন্যার ভবিষ্যৎ একাকার করায় তাঁর মন ওঠেনা। বরং তিনি প্রদীপ মেহেটাকে মেনে নিতে পারেন। প্রদীপও সেণ্টজেভিয়ার্সে স্বরূপের সহপাঠী। ভারতবর্ষের এক গণ্যমান্য রাষ্ট্রদূতের ভাইপো। যথেষ্ট কাল্‌চার্ড। তাঁদের দুটো বাড়ির পরেই সার্দার্ন অ্যাভিনিউতে মস্ত বড় বাড়ি উঠেছে তাদের। চমৎকার চেহারা, তার ওপর চমৎকার বাংলা বলে। আর তাছাড়া দেশটা যখন এক তখন বাঙালী-বাঙালী বলে মাথা কুটে লাভ কী? নিজেই তো

দেখছেন। গত কয়েক বছরে তাঁর যে প্রচণ্ড পসার তার মূলে কতটুকুই বা বক্সসন্তানের কড়ি? ও ব্যাপারটা শুধু আবেগ দিয়ে ভাবলে চলবে না। বাংলা দেশে দুটো দেশ তৈরী হয়ে গেছে। একটা বাঙালী সমাজ দারিদ্র্যে পচে মরবে, আর ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করে যেভাবে, রাজনৈতিক নেতাদের শিকার হবে, আর একটা বাঙালী সমাজ উত্তরোত্তর সর্বভারতীয় সমৃদ্ধির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলবে। দুটোকে এক করা যায় না। অচিন্ত্যর প্রসপেক্ট সম্পর্কেও তিনি ভেবে দেখেছেন। ব্যক্তিগত এলেমে কদ্দুর যাবে ছোকরা? তিনি খবর নিয়ে জেনেছেন, বড় ভাই ফ্ল্যাট নিয়েছে অন্ত পাড়ায়, বাপ পেনশানার, ছোট ভাই ভাল ছেলে হওয়া সত্ত্বেও ঝাণ্ডা তুলে বেড়াচ্ছে, বাড়ির সবচেয়ে ভাল অংশটায় মাদ্রাজী অফিসার ভাড়া বসেছে। ছোকরাকে যদি উঠতে হয় তাহলে এই অবস্থা থেকে বেরোতে হবে। বেরোতেও পারে। কিন্তু যদি না পারে তাহলে আবার সেই বাঙালী নিম্ন-মধ্যবিত্ত গাড্ডায়! সেই পয়সার জন্যে পারিবারিক ড্রামা! তিনি মেয়েকে হাতপা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারেন না!

সেদিন সন্ধ্যায় আগাথা ক্রিস্টির একটা জমজমাট উপন্যাস হাতে নীরেন গাঙুলী চুরুট খেতে খেতে এত অন্যমনস্ক হয়েছিলেন যে প্রায় আধখানা চুরুটের ছাই জামায় পড়ে। আবার সেই বহুস্য-গ্রন্থের পাতায় কে খুন করেছে এবং কে করেনি সেই সব নায়কনায়িকার পেছনে ধাবমান হতে হতে কখন জমে গেছেন খেয়াল নেই। হঠাৎ খুব হাল্কা পায়ের শব্দে চোখ তুলে চান। রীনা, ঘাড়ে ব্যাগ ঝুলছে, সমস্ত মুখে পরিশ্রান্তির ছাপ।

—তোমার সঙ্গে চা খাব বলে বসে আছি।

—আমি আসছি বাবা।

—মুখে হাতে জল দিয়ে রীনা বাপের কাছে এসে বসে। চা জলখাবার আসে।

—আজ একটা একেবারে মরিবাও কেস্ এসেছিল। মস্ত বড় কাঠগোলার মালিক। সাহেবের অনেক নামডাক শুনে এসেছে। ওকে সারানো শিবেরও অসাধ্য। নিলাম কেস।

পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে রীনা বললে,—বলেই দিলে পারতে। কেন কষ্ট করে আর আসা!

—বাঃ, লোকে কষ্ট করতে চায়। তুমি কষ্ট করতে দেবে না? সে লোকটা স্বপ্ন দেখছে বেঁচেবর্তে থাকবে, আর তুমি বলবে শ্রাদ্ধের জোগাড় ত্যাখো?

একবড়ি স্যাকারিন চায়েতে ফেলে গাঙুলী সাহেব বললেন,—তোমার একটা ছবি নাকি ভাল দাম পেয়েছে? স্বরূপ বলছিল।

শ্রান্তিতে ক্লান্ত কিন্তু হাসিতে ভরা রীনার মুখখানা মুহূর্তে কঠিন হয়ে পড়ে।

—ওটা তো একটা ইনভেস্টমেন্ট বাবা, তুমিও জানো!

—এটা তুমি কী বলছো রিন্। প্রদীপ ইজ এ গ্রেট কনয়শার অফ্ আর্ট।

—কনয়শার হলে আমার ক্যানভাস কিনতো না, সুহাসের ছবি কিনতো।

আবার জামায় চুরুটের ছাই পড়ে গাঙুলীসাহেবের। ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন,—আমি তোমাদের আর্টফার্ট বুঝি না।

এবার রীনা হাসে। সহজভাবে বলে,—তুমি মানুষের শরীরটা বোঝ। সুহাস বোঝে মনটা।

এবার ভুরু কুঁচকান, আস্তে আস্তে চুরুট টেনে বলেন,—ভাত ছিটোলে কাকের অভাব হয় না।

—মানে?

মানে সুহাস তোমাকে পাকড়াতে চায় তোমার টাকার জন্যে। তুমি তাকে পুষবে। আর সে জীনিয়াস। সে ছবি এঁকে যাবে। ছবি বিকলো কি বিকলো না—কিচ্ছু এসে যায় না।

এবার হেসে ফেলে রীনা।—বাবা, তোমার কথাগুলো যদি সত্য হোত! কী ভাল হোত!

—শুধু আর্টে কিছু এসে যায় না। আমাদের দেশ তো ফ্রান্স নয়। এখানে যারা আঁকে তাদের গরিব হতে হবে। আই হেট পভার্টি। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের এই বোধগুলো আরও হওয়া দরকার। ঐসব প্লেন লিভিং হাই থিংকিং—ওগুলো সব ব্লাফ। যাদের টাকা আছে তারা ঐ ব্লাফ তৈরি করে। আমাকে পরিষ্কার করে বল্ তো রিন্, তুই পারবি ঐ পভার্টির মধ্যে পচতে? ওর মধ্যে কোন কাব্য নেই। বিলিভ মি। তোর বয়স কম, আর ঐসব আর্টফার্ট নিয়ে মেতে আছিস। এভাবে চললে আর কয়েক বছর পর চোখে অন্ধকার দেখবি।

মৃদু গলায় রীনা স্বগতোক্তি করে, আমি যে সুহাসকে ভালবাসি।

—গুড্, তোমার ফ্র্যাঙ্কনেস্‌কে আমি তারিফ করছি। বড়কা সে যুগে স্টার থিয়েটারের বিনোদিনীকে ভালবাসত। টাকাও ঢেলেছিল বিস্তর। ব্যস ঐ পর্যন্ত। তোমাকে তো আমি বারণ করিনি। তুমি সুহাসের ক্যানভাস কিনেছো, আরো কেনো। তাকে কংক্রিটলি হেল্প করো। সেটাই দরকার। কিন্তু একমাত্র প্রেমের জন্যে বিয়ে করা তো সর্বনাশ। তাতে তুমি যেটা চাইছো সেটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি তো মরবে। সঙ্গে সঙ্গে সুহাসের ছবি আঁকাও বন্ধ হবে।

রীনা ভয়ে ভয়ে তার বাপের দিকে তাকায়। ঠিক এই কথাই সুহাস তাকে বলেছিল না? এই কমাসের ক্লান্তি, সুহাসের বারবার প্রত্যাখ্যান আর নিজের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধে মানসিক অবসাদ তাকে একসঙ্গে চেপে ধরে।

—তুমি কী বলো? আস্তে আস্তে ও বলে।

—আমি? আমি আমার মতামত তোমার ওপর ইম্পোজ করতে চাই না। তোমার কাণ্ডজ্ঞানের ওপর—বলতে কি স্বরূপের চেয়েও—আমার আস্থা আছে। আমি তোমাকে আর একবার ব্যাপারটা ভেবে দেখতে বলি। লাইফ ইজ ওয়াণ্ডারফুল—এই বুড়োহাড়েও বলছি। কারুর ভালবাসা না পেলেই জীবনটা খেলো হয়ে যায় না।

রীনা অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়িয়ে বললে,—তুমি কী বলছো বলো না।

—প্রদীপ মোহটা ইজ এ ব্রাইট বয় উইথ এ ব্রাইট ফিউচার।

—বড্ড তাড়াতাড়ি গায়ে উঠতে চায় বাবা, ফ্র্যাঙ্কলি ওকে আমার পছন্দ হয় না। ওর অনেক টাকা, অনেক প্রতিপত্তি ওদের, মনে করে তুড়ি মারলেই মেয়েরা দৌড়ে আসবে। অনেকে হয়তো আসেও। কিন্তু আমি পারব না। তার চেয়ে,…তার চেয়ে…

রীনা ইতস্তত করে। নীরেন গাঙুলী বুঝতে পারেন। বলেন,—ঠিক আছে। আর একদিন আলাপ করা যাবে। ইউ লুক টায়ার্ড।

—হ্যাঁ, মাথাটা ধরেছে।

—মাথার কী দোষ! আজও হাওড়ায় গেছিলে?

—হ্যাঁ।

—কী বললে?

—তুমি যা বললে তাই। আগেও বলত।

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকেন নীরেন গাঙ্গুলী। ফ্রান্স থেকে আসার পর কখনও এভাবে তাঁর মেয়ে তাঁকে সব কথা খুলে বলে নি। এতদিন কেন স্বরূপের মারফত কথা চালিয়ে এসেছেন ভেবে অনুতপ্ত বোধ করেন। নিজের কর্মদক্ষতার ওপর তাঁর স্বাভাবিক আস্থা আরও তুঙ্গে ওঠে। মেয়ের পিঠে হাত রেখে বললেন,—কিচ্ছু ভাবিস না রিন্। সব ঠিক হবে যাবে। লাইফ ইজ ওয়াণ্ডারফুল।

আট

শীত গিয়ে ঘামে দরদর গ্রীষ্ম। আবার শহরভাসানো বর্ষা। এ অঞ্চল ব্যাঙে হিসি করলেও ভাসে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এদিকে দু-তিন দিন ছাড়া খুব জল জমে নি এবার এখনও। সকাল থেকে আকাশ অন্ধকার, তার সঙ্গে ইলশেগুঁড়ি। মুখুজ্জেদের গেটের পাশে গোলকচাঁপা গাছটা ফুলে ভর্তি, পাশে একটা উঁচু কুরুশ পাঁচিলের শ্যাওলার ওপরে ধবধবে শাদা ছড়া বের করে আছে। আর টাকপড়া পার্কটা আবার সতেজ সবুজ ঘাসে ভরে উঠেছে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত উমাচরণের স্ত্রী জানালার দিকে চেয়ে চেয়ে শ্রাবণের কলকাতার মায়াবী শোভার দিকে চেয়ে ছিলেন। আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। তারই মধ্যে একটা আলো আকাশে বাড়িগুলোর ধসা দেয়ালে পার্কের বেঞ্চিতে খেলা করে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে মুখ বেঁকিয়ে আওয়াজ করেন।

পাশের ঘর থেকে অমলার গলা আসে,—আমি পারব না অচিন্ত্যকে বলতে। চুরি করেছে, হাজত বাস করুক।

তারপর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। এ কয়েক মাসে আর একটু মোটা হয়েছে অমলা। সে যখন চোঙার দেওয়া দামী শাড়ি পরে জিপে এসে ওঠে তখনকার চেয়ে তার এই গেরস্থালি চেহারা অনেক বেশী আকর্ষণীয়। তার চেহারা ও স্বভাবের যে স্থূলতা—যেমন মুখ ঝামটে চোখ মটকে হাত নেড়ে কথা বলা—তা অনেক মানানসই লাগে এরকম বেশে, সাধারণভাবে আঁচড়ানো চুলে। চোঙা তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে একবার চৌরঙ্গীর কোন দোকান থেকে তার মাথায় এমন চূড়ো বেঁধে এনেছিল যে সে কদাকার মূর্তি দেখে সঙ্গতভাবেই গলির স্থূলফেরতা ছেলেরা সিটি মেরেছিল। অমলা তার হাত-খোঁপা ঠিক করতে করতে বলে,—তাই বলি! কদিন থেকে মোটা মোটা ইলিশ মাছ আসছে। এটা যে চুরির টাকা তা তো বুঝি নি।

আবার গোঙানো আওয়াজ আসে। এবার আওয়াজের দৈর্ঘ্য আগের চেয়ে বেশী।

অমলা বললে,—তোমরা আমাকে কি ভাবো বল তো। তোমরা আমাকে ওরকম ভাবো বলেই অচিন্ত্যও ওরকম ভাবে। আমি শালা সেজেগুজে বসে থাকব ওঁর জন্যে। আর বাবুর যখন সুবিধে হবে তখন আসবেন। অমলা হাত নেড়ে নেচে নেচে বলে। তারপর নিজের মনেই গজরায়,—ওঃ,

বাবুর বড় পীরিত করার শখ! শখ তো যা না এদিক সেদিকে যত দোকান পাতা আছে সেখানে। না, সেখানে যাব না, সেখানে গেলে লোকে কী বলবে!

তারপর অমলা কাঁদল, কেঁদে চোখ মুছে পাউডার মেখে শাড়ি পালটে পাশের মুখুজ্জেদের বাড়ি ফোন করতে গেল।

অমলা কখনও অফিসে ফোন করে নি। ফোন পেয়ে অবাক হয় চোঙা।

—কী! আঁতকে উঠলে মনে হল!

—না না, বল না, কী ব্যাপার? আমার আজ স্পেশাল ফিচারের দিন। বলে ফেলো।

—বাবা অ্যারেস্ট হয়েছেন। জামিন দিচ্ছে না।

—সে কী!

—হ্যাঁ, স্কুলের তহবিল তছরুপের অভিযোগে। বেশ কিছুদিন থেকেই নাকি ব্যাপারটা ঘোঁট পাকাচ্ছিল। যাই হোক, তুমি জামিনের একটা ব্যবস্থা করো।

চোঙা চটে যায় অমলার এই হুকুমের গলায়। সঙ্গে সঙ্গে মায়াও লাগে। অমলা তো জানে না সে কতদূর সরে এসেছে তার কাছ থেকে, এমনকি সে যে নিজের আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শী বন্ধু-বান্ধব থেকে সরে আসছে ক্রমশ তার খবরও তো তার নাগালের বাইরে। চটে উঠলেও পরমুহূর্তে তার প্রতি অমলার নির্ভরতায় সে আত্মতৃপ্ত না হয়ে পারে না। দূরত্ব বজায় রাখলেও লোকে তাকে আপনার ভাবছে—এতে সে আত্মপ্রসাদ বোধ করে।

—মুচিপাড়া থানা তো?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, আমি দেখছি। একটু থেমে বললে,—এত কাজের মধ্যে পড়ে গেছি অমু, বিশ্বাস করো। একদম যেতে সময় পাচ্ছি না।

কিন্তু অমলা ফোন ছেড়ে দিয়েছে।

চোঙা তার কথা রেখেছিল। সেই সন্ধ্যেবেলায় গোটা দুনিয়াটাকে গাল পাড়তে পাড়তে উমাচরণ বাড়ি ঢুকলেন।

—শালা জামিন দেবে না? তোর বাবা দেবে!

চায়ের পেয়ালা বাপের হাতে দিয়ে অমলা বললে,—অতো ফড়ফড়িও না। অচিন্ত্যদার জন্যে তো জামিন পেলে।

অমলার কথা শেষ হতে না হতেই চা-ভর্তি পেয়ালাটা ছুঁড়ে দিলে গুরুচরণ মেয়ের গায়ে। অমলা উঃ বলে দৌড়ে পালায়। ধোঁয়া-ওঠা চায়ের ছেঁকায় অমলার গলায় ফোস্কা পড়ে।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা চোঙা উমাচরণের চৌকাঠে পা দিতেই অমলা বললে,—তুমি আর আমাদের বাড়ি এসো না।

—মানে? তোমাকে নিয়ে আমি আজ চিনেবাড়ি যাব। অনেক দিন ভালমন্দ খাওয়া হয় নি। ওসব ন্যাকামি কোর না, ওঠো। চট করে শাড়িটা পাল্টে নাও। বাব্বাঃ, মেশোমশাই কি কাণ্ডটাই না করেছে! যাই হোক, তুমি ওসব কিচ্ছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। একটু পয়সা খরচা হবে,

ঐ যে কেরানী ছোকরাটা আছে, স্কুলের ক্যাশ দেখে। ওকে হাত করতে হবে। লোক লাগিয়েছি। হয়ে যাবে।

—আমি যাব না তোমার সঙ্গে। বাবার বারণ আছে।

—বাবার বারণ! ভূতের মুখে রামনাম! তারপর উত্তেজিত হয়ে চোঙা বলে,—তোমার লজ্জা করে না অমু, একটা চোরের নাম করতে। জানো, প্রায় হাজার তিনেক টাকা মেরেছে। রেসে টাকা উড়িয়েছে। আমি সব খবর নিয়েছি। সমস্ত পরিবারটাকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে লোকটা!

প্রায় একটা বক্তৃতা করে ফেললে চোঙা।

—আমি কী করে যাব? দেখছো না? চোখ নেই?

—কেন, কী হয়েছে? বলেই চোখ পড়ে অমলার গলায় জলভরা বড় বড় ফোস্কাগুলোর ওপর।

—কী করে হল?

—তোমার জন্যে! তোমার জন্যে জামিন হল বলতেই বাবা — —

অমলা মাথা নীচু করে থাকে। চোঙা লক্ষ করলে সে কান্না সামলাচ্ছে।

মেজাজটা একদম ঝুলে যায়। বলতে কি, তার চারপাশের সাফল্যের মধ্যে চোঙা এমনভাবে এগিয়ে চলেছে যে কোথাও হোঁচট খেলেই সে অবাক হয়। বেকায়দা জায়গাটা আবার গরম করতে গিয়ে আর একবার ইচ্ছে করেই হোঁচট খায়।

—মেশোমশাইয়ের ভীমরতি ধরেছে।

—তুমিও আর এসো না। গাড়ির চাকার হাওয়া খুলে দেবে বলেছে পাড়ার ছেলেরা।

মুখটা একেবারে তিতো হয়ে যায় চোঙার। আধুনিক জীবনের জয়যাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রকাণ্ড কুনোমির কান্নায় গড়াগড়ি-খাওয়া পচাগলিটার জীবন তাকে অস্থির করে। অস্থিরতা দমন করবার জন্যে বলে,—চা করো, চা করো, বাজে কথায় কান দিও না।

আবার রিম ঝিম করে বৃষ্টি শুরু। গদাম করে পার্ক থেকে ফুটবল পড়ে বাড়িটার বন্ধ দরজায়। চোঙা চমকে ওঠে। চোঙা মনে মনে অমলা ও রীনা এই সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের বাসিন্দেকে পাশাপাশি রেখে বিচার করে আরাম পায়। অমলা অশিক্ষিত, স্থূল, রীনার পাশে তো বটেই। কিন্তু অমলাকে যেমন তেমন ইচ্ছে গড়ানো যায় পেটানো যায়, রীনার প্রসঙ্গে কোন কথাই ওঠে না। সে যেভাবে জাল ফেলেছে তাতে রীনা তার দিকে ক্লান্তিতে অবসাদে সমস্ত পথ হারিয়ে এগিয়ে আসছে—একথা অবধারিত। তার স্টেটাসের জন্যে, তার জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্যে রীনাকে প্রয়োজন, কিন্তু এই যৌবনের এনার্জিতে ঝলমল, উৎসুক উচ্ছ্বসিত, আঙুলনাড়ানো চোখমটকানো সঙ্গিনীটি তার জীবন থেকে সরে গিয়ে একটা মস্ত ফাঁক রেখে যাবে একথাও নিশ্চিত।

—তোমার একটা বিয়ে ঠিক করেছি অমু, চোঙা বললে কথাগুলো ধীরে ধীরে অমলার চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে।

অমলা সে কথায় কান না দিয়ে বললে,—কোথায় যাবে বলছিলে। শাড়িটা পাল্টে আসি।

অমলার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিয়ে জুত করে পা তুলে বসে চোঙা। আবার সেই তুলনামূলক আলোচনার দিকে তার মন ছোটে। অমলা সত্যিই কুমোরের কাদা, তাকে যেমন ছাঁদে ফেলো

তেমনি তার গড়ন নেবে। আর রীনা একেবারে ব্রোঞ্জের কিংবা পাথরের ভাস্কর্য। তার ছাঁদ ফেরানো অসম্ভব। বাইরের বৃষ্টির মৃদু আওয়াজ আর ফুটবল পেটানোর শব্দ।

—তুমি চা খেলে না?

—আমি চিনে খাব। চোঙা হেসে বলে,—অমু, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

অমলা ভয়ে ভয়ে তাকায়। বলে,—সেসব পরে হবে। বাবার আসতে অনেক দেরি। এই বেলা চলো ঘুরে আসি। রান্না করতে করতে গায়ে শ্যাওলা পড়ে গেল।

—আমি তোমার একটা বিয়ে ঠিক করেছি অমু।

অমলার হাসিতে ভরা মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর থমথমে হয়ে পড়ে। এত তাড়াতাড়ি ভাবান্তর চোঙা কল্পনা করে নি।

—আমাকে খাওয়াবে না?

অমলা চুপ করে থাকে।

—না না, ব্যাপারটা যে আমি একেবারে ভাবিনি তা নয়। আমাদের স্টোরে কাজ করে। ছেলেটা ভাল, বয়স একটু বেশী হবে। তবে ছেলেটা সত্যিই ভাল। উত্তরপাড়া থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে, স্বাস্থ্যটাস্থ্য ভালই, এক বোন, তার বিয়ে হয়ে গেছে, ঝামেলা নেই।

অমলা উঠে গিয়ে আলনা গুছোতে থাকে। চোঙার প্রস্তাবে তার মৌন প্রতিবাদ ক্রমশ প্রকট হয়। কিন্তু চোঙা দমে না। বলে,—ভাখো অমু, শুধু ভাবের গঙ্গায় ভাসলেই চলে না। মানুষকে উঠে দাঁড়াতে হয়।

—চুপ করো। অতো গলাবাজি কোরো না। তারপর চোঙার মুখের সামনে হাত নেড়ে অমলা বলে,—এতদিন যে ভাবের গঙ্গা কুল কুল করে বইছিল। এই এক মাসেই সব শুকিয়ে গেল?

—ছেলেমানুষি কোরো না।

—বেশ করব। আমি ছেলেমানুষি করি কি বুড়োমানুষি করি তার ওপর তোমাকে খবদারি করতে হবে না।

—কেন এসব ঝামেলা বাড়াচ্ছো? কথাটা শোনো।

—কী কথা? কথাটা কী? করুণা, অনুকম্পা! আহা, মেয়েটাকে একেবারে জলে ফেলে দিলেম গো! অমলা সুর করে চেঁচিয়ে ওঠে।

—এভাবে আর বেশীদিন চলতে পারে না অমলা।

—সেটা তুমি আপনাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলেও চলবে।

তারপর প্রায় জন্তুর মতো চোঙার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে,—তুমি আমায় কী পেয়েছো বল তো? কী পেয়েছো? রাগে পাগলা হয়ে চোঙার গাল খামছে ধরে অমলা।

—কী করছো? পাগল হয়ে গেলে নাকি? ছাড়ো।

—হ্যাঁ, পাগল হয়ে গেছি। আমি পাগল হয়ে গেছি! চোঙাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কাঁদতে থাকে অমলা।

আর সেই রোরুদ্যমানা নারীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে নোনাধরা ইটবারকরা দেয়ালের দিকে

একান্ত বিরক্তির সঙ্গে চেয়ে থাকে চোঙা। নিজেকে সে আগেও বলেছে যে পাঁকের পদ্মফুলের দিকে সে হাত বাড়িয়েছে। কিন্তু সে পদ্মের সংস্পর্শে আসতে গেলে এক এত পাঁক ঘাঁটতে হয় যে তার পোষায় না। আর সে এই পাঁকে পড়ে থাকতে চায় না। একবার সে ভেবেছিল দুই নারীর সান্নিধ্যই চালিয়ে যাবে। কিন্তু তার জন্যে যে চাপ সৃষ্টি হবে তার ধকল সামলানো মুশকিল হবে। সেদিক থেকে অমলার কাছ থেকে বিদায় অপরিহার্য। কিন্তু অফিসের আরও অনেক ব্যাপারের মতো, তার কেরিয়ারের প্রাকারে নতুন নতুন বিজয়কেতন ওড়ানোর মতো অমলার ব্যাপারটাও ঠিক ছকে পড়ে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু তা না হওয়ায় তার বিরক্তি বাড়ে।

চোখ মুছে জলভরা গলায় অমলা বললে,—তোমাকে আর মাবার আগে দয়া দেখিয়ে যেতে হবে না। দয়া তো দেখালেই। বাবার কেসটা চাপা দিয়েছো, ঐ যথেষ্ট।

—ছেলেটা ভাল ছিল অমলা। দুদিন পরে পস্তাবে।

নিষ্প্রাণ কণ্ঠে অমলা বললে,—ছেলেবেলা থেকেই পস্তাচ্ছি, জন্মানো অবধি। তারপর যখন বয়স বাড়লো, পস্তানো আরও বেড়ে গেল। আর কী পস্তাব?

একটুক্ষণ চুপ করে গলাখাঁকারি দিয়ে বললে,—আমার জন্যে ভেবো না, ও একটা কিছু হয়ে যাবে। আর আমি জানতাম; তুমি যে আমাকে কোনদিন বিয়ে করবে না, এটা আমি প্রথম থেকেই জানতাম। তার জন্যে তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। মাঝখানে তুমি আসতে। এই একটু হেসে খেলে দিন কাটতো। তা আর কাটবে না, তাতে কী।

আলমারির তাকে ডেটলগোলা জল ছিল। একটা কাপড়ের টুকরোয় লাগিয়ে চোঙার গালে আঁচড়ের ক্ষতের ওপর লাগিয়ে দেয় অমলা।

চোঙা বোকার মতো নীচু গলায় বললে,—ছেলেটা কিন্তু ভাল ছিল।

—বৃষ্টি ধরে গেছে। এবার তুমি এসো।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে পেছন ফিরে তাকায় চোঙা। চৌকাঠে পৌরাণিক নায়িকার মতো দাঁড়িয়ে আছে অমলা।

নয়

মাস ছয়েকের মধ্যেই চোঙার অভীষ্ট পূর্ণ হল। চোঙার কলাম সাংঘাতিক জনপ্রিয়তা অর্জন করলে। মাথনের ডেলার মধ্যে ছুরির অবলীলাক্রম গতির মতো বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হৃদয়ে তার লেখনী প্রবেশ করল। ঘটনাকে ঠিক ঘটনা রূপে তুলে না ধরে তাকে নাটকীয় করার শক্তিমত্তায় দেশে বিদেশে আধুনিক খবরের কাগজের যে রূপ সে রূপকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টায় চোঙা উঠে পড়ে লাগল। সে সমস্ত সামাজিক কাহিনী তার কলামে লিপিবদ্ধ করে তার বেশীর ভাগই হয়তো ধোপে টেকে না, কিন্তু তাদের আকর্ষণ দুর্নিবার।

ছ'মাস পর রতন সরকার খবরটা দিয়ে বললেন,—তোমার নতুন পোষ্টিং নিয়ে আপত্তি উঠেছিল, বুঝলে? বেশ কয়েকটা লোককে ডিঙোতে হল তো! আমি বোর্ড মিটিংয়ে বলেছিলাম—আপনারা কী চান? কাগজটার উন্নতি চান?

চোঙার উন্নতিতে অফিসের লোকজন দুই শিবিরে বিভক্ত হয়—এক্সিশিয়েন্সি ও সিনিওরিটির শিবিরে। চোঙা এই সমস্ত ব্যাপারটা খুব দূর থেকে দেখেছে, ঠিক দল পাকায়নি। অথচ যেখানে যেখানে ফুলকলা দেওয়া দরকার ঠিক দিয়ে এসেছে। সম্প্রতি ছুটির দিনে ভবনাথের বাড়ির সামনে গাড়ি থাকে। পার্টির নেতা যিনি আর এক পার্টিকে ল্যাং দিতে চান, জনৈক শিক্ষাবিদ যিনি তাঁর সংস্থায় দুর্নীতির অভিযোগ চাপা দিতে চান, বেকায়দা-পড়া পুলিস অফিসার, প্রাইজ-অভিলাষী লেখক, ট্রান্সফার-উন্মুখ অধ্যাপক, এ ছাড়া কোন কোন মহিলা যাঁরা লিখতে চান, অথবা আর্ট মহলে জঘন্য ষড়যন্ত্র প্রকাশের তাগিদে যাঁরা উদ্‌গ্রীব—কেউই বাদ যান না। ভবনাথ অবাক হয়ে দেখেন যার সম্পর্কে কখনও স্বপ্ন দেখেননি সেই দ্বিতীয় পুত্রই তাঁর বাড়ির মান রাখলে।

কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন চলে না। চোঙার পক্ষে তার পরিবেশ ক্রমশ খুব ছোট্ট হয়ে পড়ে। স্বর্ণসুন্দরী আগে খবরাখবর জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। এখন আর করেন না। বুঝতে পারেন চোঙা তার নিজস্ব কক্ষপথে বিচরণ করছে। আর তার সাবালকত্বে তাঁর এবং ভবনাথের মানসিক নির্জনতা আরও বেড়ে যায়।

ইতিমধ্যে একদিন সকালে টুটুলের ঘরে ঢুকে পড়ে চোঙা। টুটুল সম্প্রতি দাড়ি রেখেছে। চোঙার মতো লম্বা নয়, আরও স্বাস্থ্যবান চেহারা। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল আর ছুঁচলো দাড়ি মিলে তার যে চেহারা বছর দুয়েক আগের চেহারার সঙ্গে তার মিল নেই। ঘরভর্তি পোস্টার—'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক', 'দুনিয়ার মজদুর এক হও।' লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি ঘরের দেয়ালে।

টুটুল পড়ছিল। চোঙাকে দেখে টুটুল বলে,—কী মনে করে?

চোঙা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরায়।—তুই কোথায় চলেছিস ভেবে দেখেছিস?

—আমাকে কনভার্ট করতে এসেছো?

—দূর! তোকে কি কনভার্ট করব! আমার বোধহয় কিছু দিনের জন্যে বাইরে যেতে হবে।

—এমেরিকা?

—হ্যাঁ।

টুটুল তার হাতের বইটা রেখে বলে,—আচ্ছা, ছোড়দা, তোর মনে হয় না তুই একেবারে ছকে পড়ে গিয়েছিস! একবারও মনে হয় না?

—তোর ছকটাও তো ছক। এই পুলিশের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় হাঙ্গামা—আর কদ্দিন চালাবি? অনেক বয়স তো হোল? প্রেম-ট্রেম করছিস?

টুটুল হঠাৎ চটে গিয়ে বলে,—ছাখ, তোর ঐ পিঠচাপড়ানি তোর অফিসে চালাস, যেখানে তুই হিরো।

—আমি শুধু অফিসের চারদেয়ালের মধ্যেই থাকি না। আমার লেখার জন্যে কত চিঠি পাই জানিস?

—প্লিজ, তোর ঐ খবরের কাগজের খ্যাতি দিয়ে সারা দেশটাকে বিচার করিস নে। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বলে,—তোরা আসলে কিছু না, একেবারে পোকা। রঙচঙে বাহারে পোকা, ফরফর ফরফর করে নাকের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছিস।

—আর তুই ? ইউ আর এ ফুল! ঝাণ্ডা কাঁধে করে বিপ্লব বলে চেঁচালেই বিপ্লব আসে না।

—সম্পাদকীয় লিখলে আসে।

চোঙা দমে যায়। সমস্ত পৃথিবী জয় করে এসে ছোট ভাইয়ের তীব্র উপেক্ষা তার কাছে অসহনীয় লাগে। অবাক লাগে ভাবতে এই মাত্র কয়েক বছর আগেই তারা একসঙ্গে স্কুলে দৌড়েছে, মাঠে বাগানে খেলা করে বেড়িয়েছে।

—আচ্ছা, আমি না হয় এসটাব্লিশমেন্টের দালাল কিন্তু···

—যাক, স্বীকার করছো নিজের মুখে···

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু তুই এটা কী করে বেড়াচ্ছিস ? তোকে ভাবতাম, কবি, আদর্শবাদী, ভালছেলে। তুই যে শেষ পর্যন্ত এরকম শার্টের হাতা গোটানো রগফোলানো জনতার মাত্র একজনে পর্যবসিত হবি স্বপ্নেও ভাবি নি।

এবার তার দাড়ি আর চুলের মাঝখান থেকে টুটুলের বড় বড় চোখ দুটো একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দাদার দিকে।—তুই একটা খুব ভাল কথা বললি। আমার কবিতা, আমার আদর্শ, আমার পড়াশোনা, বিশ্বেস কর, ওগুলো আমি ছাড়তে চাই না, যত দিন যাচ্ছে ওগুলোর প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। আমার চারপাশের জগৎটা একেবারে ফোতো হয়ে গেছে। আমি সেখানে বাঁচবার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছি না। এক-একবার চোখ রগড়ে ভাবছি। কোন্‌টা রিয়াল? সেই স্বপ্নেভরা ছেলেবেলার বাঁচাটা, না এই চারপাশের বাঁচা ? আমি—আমি এখনও হাতড়াচ্ছি।

—একেবারে নন্‌-মার্কসিস্টদের মতো কথা। শেষ পর্যন্ত গান্ধিবাদী হয়ে যাবি না তো ?

—ছোড়দা, স্মার্ট হোস নে, প্লিজ! জীবনটা আরও অনেক জটিল, বিচিত্র, ওরকম স্মার্টভাবে রায় দিলে বাহবা পাওয়া যায়। কিন্তু ওতে কিছু হয় না।

—কিসে হয় ?

—আমার কথা ছাড়। আমাদের দুটো জগৎ একেবারে আলাদা। তার থেকে তোর নিজের কথা বল। শুনলাম তোদের অফিসের কর্তৃপক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল বেধেছে ?

—হ্যাঁ, রতনদা নক-আউট হয়ে গেছে। ওর ক-আনার মালিকানা কিনে নিয়েছে কর্তা।

—তাহলে ? তোর পেট্রন তো ডুবল।

চোঙা গম্ভীরভাবে বললে,—তার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। আমি এখন খোদ কর্তাকে তালিম দিচ্ছি।

—বাঃ। অদ্ভুত আওয়াজ বেরোয় টুটুলের গলা দিয়ে।

—এতে অবাক হবার কী আছে! আসলে জিভটা অন্যভাবে ঘুরানো। একদিকে ঘুরাতাম, আর একদিকে ঘুরাবো। কোনো ঝামেলা নেই, জিভে কোনো হাড় নেই।

[ক্রমশঃ]

যখন আবহাওয়া খারাপ

শামসুর রাহমান

হাওয়ায় সে নয় আর, এখন তো বিশ্বাসঘাতক ক্ষুরধার
হাওয়া সারাক্ষণ শাঁ শাঁ বয়। তার ওড়ার দুর্বার
ইচ্ছা চোখ বুজে থাকে নিষ্ক্রিয় ডানায় ; বৃষ্টির শলাকা,
ঝাঁক ঝাঁক, করেছে এমন কোণঠাসা তাকে, এখানেই ঢাকা
বস্তুত থাকতে হবে ডালে,
জবজবে পাতার আড়ালে।
নিজস্ব আকাশ মুছে যাবে ? ধুন্ধুমার যুদ্ধক্ষেত্রের মতন
থাকবে সর্বদা পরিবেশ ? বাসনার রঙধনু যতক্ষণ
আবার না জ্ব'লে ওঠে সে আর সে নয়। পারলে হাওয়ার ঝুঁটি
নিমেষেই কাটতো সে ইস্পাতের মতো নখে কুটি কুটি।

কী ভীষণ বোকা আর উদ্যমরহিত তাকে লাগছে এখন,
যেন সে পুঁটুলি ন্যাকড়ার, সপসপে। প্রেতায়িত ঘন বন
ব্যাপ্ত শহরের রুক্ষ বুকে ; ভাবে, যে-পানি তৃষিত প্রাণে আনে
সুস্নিগ্ধ উচ্ছ্বাস, তারই এত হুল ?, দুঃখ দিতে জানে
জলধারা ; অন্ধকার আসে ব্যেপে, বৃষ্টি অবিরল,
সে কি হলো দৃষ্টিহারা ? দেখবে না কখনো কিছুই আর ? একা, হীনবল
এখানে থাকবে প'ড়ে সর্বক্ষণ পরিণামহীন ? আধ ঘণ্টা হবে—
এরই মধ্যে ভুলে গেলে ওড়া ? কে ছড়ালো কালি ডানার গৌরবে ?

নাস্তির ডমরু শুনে এখনই এ দ্বিপ্রহরে পঙ্গু হ'লে ডানা,
অস্তাচলে যাবে স্বপ্ন, নীলিমার অনেক সীমানা,
কে জানে কী শোভাময়তায়, রইবে অগোচরে, স্পর্শাতীত। অন্ত
নেই অতৃপ্তির, অন্ধ গুহাতেও পুশিদা রোদ্দুর চায় সন্ত!
মনের ভেতর তার আর্তি আর ভীতির উত্থান—
সঙ্কুচিত অস্তিত্বে অকাল শীত দিয়েছে কামড়, খুব ধ্যান
ক'রেও ছাখে না কোনোখানে ফসলের কোনো শীষ,
কখনো আসে না ভেসে এ তল্লাটে উর্মিল মধুর শিস্ ;
তাহ'লে পাখিরা মৃত সব ? এখন তো ফুল শুধু,

পাথরের বোন, যতদূর দৃষ্টি যায় শূন্যতায় কাঁপে, ধু ধু ;
দিগন্তে দিগন্তে এলো ছেয়ে ছত্রাকের দল ; এলো এ কেমন কাল ?
চতুষ্পার্শে লভ্য নয় কোনো কিছু, এমনকি স্মৃতিরও আকাল।

চকিতে আবার বয় হাওয়া ভিন্নতর, বিকশিত স্মিত রোদ
মাটিতে আকাশে ডালে ডালে, সে নির্ভার ওড়ে, কী স্বচ্ছন্দ বোধ
এখন সত্তায় তার, কী প্রত্যাবর্তন ! পারবে যথেচ্ছ যেতে
এখন সে সহজেই, কুড়াবে সপ্রাণ শস্য নীলিমার ক্ষেতে।

রূপান্তর

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

কিরণ বাতাস ঢেউ কিংবা অন্য কোনও আন্দোলন
কিছুই ছিল না তবু অন্ধকার থেকে শুরু হলো
প্রস্তুতিবিহীন এক গন্ধের সহজ সঞ্চরণ,
যদিও প্রচ্ছন্ন নয়, কিন্তু তাকে আবার স্বচ্ছলও
বলা ভুল, অচিহ্নিত, অনির্দেশ্য বেণুধ্বনি সূচনা,
যেমন শিকড় ঢেলে মাটির গভীরে গূঢ় পাখা
বনস্পতি মেলে দেয়, আকাশ আবৃত প্রযোজনা,
বিদগ্ধ শূন্যের গায়ে লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা
ক্রমশ রূপান্তরিত : মিশে যায় মন্থর তরঙ্গে,
চলে গিয়ে ফিরে আসে মেঘে মেঘে, হয়তো তখনই
আরও বেশি স্পর্শময়, আশ্লেষে সঘন অঙ্গে অঙ্গে
গন্ধের মূর্চ্ছনা বাজে যেন দূরাগত প্রতিধ্বনি
আহ্নিক পুষ্পের মতো পুনরায় ফুটে ওঠে ধীরে
বাহুতে জানুতে স্তনে সুষমার আশ্চর্য শরীরে।

ট্রাপিজ

নবনীতা দেব সেন

লক্ষ্যস্থির করা আছে, অথচ এ তীরন্দাজি নয়
এ তো ট্রাপিজের খেলা
দূরে কাছে দূরের দোলন।
অথচ, এ স্নেহহীন নিরালম্ব টানা ও পোড়েনে
কিছুই হবে না বোনা।
শুধু মহাশূন্য কেটে অবিরাম সর্পিল স্থলন।

এবং যেহেতু নিচে, বহু শূন্য পার হয়ে, নিচে
ঊর্ধ্বমুখ, রুদ্ধশ্বাস, সংখ্যাহীন দর্শকের ভিড়
এবং নাইলনজাল পাতা নেই সভার সৌষ্ঠবে,
সাবধান! হাতের মুঠো হয়ে যাক লোহা
চরণে মরণ ঠেলে ফ্যালো।

চোখেরই নৈপুণ্য নয়, এই লক্ষ্যভেদে
সর্বাঙ্গে দক্ষতা চাই। মৃত্যুপণ করে দড়িখেলা।
আলগোছে ছুঁয়ে থাকা
ছন্দোবদ্ধ স্পন্দিত ত্রিকাল।

উদ্ভূত সেই পরিস্থিতিতে আমি যা যা করতে পারতাম

রফিক আজাদ

আমি তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সারারাত আদর করতে পারতাম;
যেমনটি করতে ইচ্ছে করতো দশ বছর আগে।

আমি তাকে উপেক্ষা করতে পারতাম;
যেন তাকে কোনোদিন, কখনো, কোথাও দেখিনি।

মধ্যযুগের রাজা-রাজড়ার মতো তার স্বামী ও সন্তানকে মেরে ফেলে
তাকে নিয়ে ঘর করার চেষ্টাও করতে পারতাম; কেননা, তখন
'ক্ষমতা'-নামে এক অন্ধ দানব আমার আজ্ঞাবহ ছিলো।

কিম্বা তার অসহায়, আশ্রয়-প্রার্থী, ক্ষুধার্ত স্বামী ও কিশোর
সন্তানের সামনেই তাকে আমি বলাৎকার করতে পারতাম।

কিন্তু এ-সবের কিছুই আমিই তাকে করি নি।

বৃষ্টি

রমাবাই দে

তোমার ডাক আমি শুনতে পাইনি
বৃষ্টির শব্দে
তুমি আমাকে ডেকেছিলে কি ?
বুঝতে পারিনি
বৃষ্টির শব্দে।
দেখেছো, জলের ফোঁটা কত ভারি
তবু তো ঝরেই চলেছে

নিউটন বলেছেন জানি
মাধ্যাকর্ষণ আছে
কিন্তু তার ব্যাখ্যাটাই আগে আমি
পুরোপুরি বুঝিনি
ভেঙ্গে গুঁড়াবে অথবা টোল খাবে
কিম্বা নানা বিকৃত ভঙ্গিমায়
মাটির সাথে মিলিয়ে যাবে
ঊর্ধ্বমুখী হয়ে চেয়ে দেখো
উপরের ঐ দৃপ্ত মেঘ
ক্রন্দনের ভারে কালো হয়ে আছে
তবু ঝরার পালা এখনো থামেনি।

তুমি আমায় ডেকেছিলে কি
এই বৃষ্টির মাঝে ?
আমি শুনতে পাইনি।

ফিরে দেখা

মিহির মুখোপাধ্যায়

দুবছর আগের কথা। সকালবেলা শেয়ালদা স্টেশনে এসেছি। ছ'টা বারো মিনিটের বনগাঁ লোকাল ধরব। তখন পৌনে ছ'টা। শীতের সকাল। শহরের ঘুম ভালভাবে ভাঙেনি। কিন্তু শেয়ালদার ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। ছোকরা হকারদের হাঁকাহাঁকি।

কেউ স্টেশন এলাকায় ঢুকলেই ছুটে এসে তিন-চারজন ঘিরে ধরবে। ওরা কিন্তু আমার কাছে আসে না। আমি রোজ এক বুড়োর কাছ থেকে কাগজ কিনি।

তেরো-চোদ্দ বছরের রোগা একটি মেয়েকে পাশে নিয়ে নর্থ প্লাটফরমের সামনে বসে বুড়ো। বসে বসেই ব্যস্ত হাতে পয়সা গোনে। টুকরো কাগজে পেনসিল দিয়ে হিসেব লেখে। আর মেয়েটি তখন সাজানো ইংরেজি-বাঙলা কাগজ থেকে তুলে তুলে খদ্দেরদের হাতে দেয়। আজও আমার হাতে কাগজ দিল। আমি পয়সা দেবার সময় একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ ঘোড়ার গাড়ি কাছেই এসে দাঁড়াল। কাছাকাছি বয়সের চারপাঁচটি ছেলেমেয়ে, তিনজন মহিলা, একজন পাকাদাড়ির বুড়ো মানুষ নামলেন গাড়িটা থেকে। সঙ্গে প্রচুর লটবহর। এদের তদারক করছিল একজন শক্তসমর্থ যুবক। গাড়ির ভেতরে জায়গা কুলোয়নি বলে সে বসেছিল গাড়োয়ানের পাশে। তার মুখে কালো কুচকুচে চাপদাড়ি, চোখে সুর্মা, মাথায় গোল কাপড়ের টুপি, পায়জামা পাঞ্জাবি। দেখলেই বোঝা যায়, এরা সব বাস্তুহারা দেশের যাত্রী। হাঙ্গামার সময় কলকাতা পালিয়ে এসেছিল। এখন দেশ স্বাধীন হবার পর, অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসায় আবার দেশে ফিরে যাবে। রোজ সকালে এই বনগাঁর গাড়িতে এরকম বহু পরিবারকে আমি ফিরে যেতে দেখি। সুতরাং তেমনভাবে কোন মনোযোগ না দিয়ে আমি স্টেশনের ভেতরে এলুম। ছ'টা বাজতে মিনিট দশেক বাকি। এখনো প্লাটফর্মে গাড়ি দেয়নি। আমি একটা বেঞ্চে বসে খবরের কাগজের বড় বড় অক্ষরগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি। একটু পরেই সেই পরিবারটি আমার কাছেই এসে গুছিয়ে বসল। সেই যুবাটি জিনিসপত্তর ঝাঁকার ফাঁকে ফাঁকে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। আমি বেঞ্চির এককোণে বসে মুখের সামনে কাগজ ধরে ওদের লক্ষ্য করছিলুম। এক-সময় যুবাটি আমার সামনে এসে বললো,—স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

—বলুন।

—আপনি কি কখনো বরিশালে ছিলেন ?

আমতা আমতা করে বললুম—হ্যাঁ, কেন বলুন তো ?

মনে মনে তখন পুরনো স্মৃতির দরজায় ধাক্কা দিচ্ছি।

—আপনার নাম তপনবাবু না ?

—হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো ঠিক—

—আমি দুরুল, শামসুলকে মনে আছে আপনার ? আমি শামসুলের ভাই।

মুহূর্তে স্মৃতির দরজা খুলে গেল। আর সেই খোলা দরজা দিয়ে একরাশ টুকরো ছবি

শুকনো পাতার মত আমার সামনে ছড়িয়ে পড়ল। আমার সঙ্গে এক ক্লাশে পড়তো শামসুল। ক্লাশ ফাইভে এসে প্রথম ভর্তি হয়েছিল। প্রথম দিনের কথা মনে আছে। মনে রাখার মত ঘটনা। প্রথম ঘণ্টায় শচীপতিবাবুর ইংরেজির ক্লাশ। বাঘের ক্লাশ। আমরা সব কেঁচো হয়ে বসে আছি। উনি পড়া ধরছিলেন। যে কোন বেঞ্চি থেকে এক-একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করছেন।—ইউ, ইউ, স্ট্যাণ্ড আপ। তারপর ইংরেজিতে প্রশ্নোত্তরের পালা। তারপর ইংরেজি শব্দের বানান এবং বাংলা মানে বলতে হবে। কার পালা কখন আসবে, আন্দাজ করা যায় না। সে কারণে সকলেই সমান উদ্বিগ্ন। চল্লিশটা ছেলের ক্লাশে সচীপতন নৈঃশব্দ্য। এমন সময় একটি ছেলে গটগট করে ক্লাশে ঢুকল। আমাদের চেয়ে মাথায় কিছু লম্বা, বয়সেও দু-তিন বছরের বড় হবে। ধোপদুরস্ত পায়জামা-পাঞ্জাবি, পাম্প-শু। ঘাড়ে-গলায় পাউডার। চোখে সুর্মা, গায়ে ভুরভুরে সুগন্ধ। এবং নতুন জুতোর মচমচ শব্দ। ক্লাশে ঢুকে কাউকে কিছু না বলে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে একেবারে লাস্ট বেঞ্চিতে রজনী পণ্ডিতমশাইর নাতি ভুষুর পাশে বসে পড়ল। আমরা হতভম্ব। শচীপতিবাবু ভয়ানক গম্ভীর মুখে ছেলেটির দিকে তাকালেন। অঙ্কিত দাগ ওরফে লেদু পড়া বলবার জন্য সবে দাঁড়িয়েছিল। ওই রকম একটা আবির্ভাব দেখে সব গুলিয়ে গেল। কিছু না বলেই দাঁড়িয়ে রইল। লাস্ট বেঞ্চে ভুষুর ডান পাশে বসেছিল মাখন বক্সী, বাঁ পাশে নতুন ছেলেটি। কয়েক সেকেণ্ডের আবহাওয়ার মধ্যে হঠাৎ মাখন মুখ নিচু করে খুক খুক করে হেসে উঠল। পরক্ষণেই একটা চাপা হাসির ঢেউ উঠল সারা ক্লাশে। আরো গম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন শচীপতিবাবু,—সাইলেন্স, চুপ, চুপ করো সব। আবার চুপচাপ। আলপিন পড়লে শোনা যায়—শচীপতিবাবু আবার খনখনে গলায় হাঁক দিলেন,—এই তুমি, তুমি উঠে দাঁড়াও।— নির্বিকার ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল ছেলেটি।

—তোমার নাম কী?

—শামসুল হক।

—তুমি কি আজই নতুন ভর্তি হয়েছ?

—জী।

—আগে কোন্ স্কুলে পড়তে?

—রহমতপুরের পাঠশালায়।

রহমতপুর জেলাশহর থেকে আট মাইল দূর। শামসুলদের দেশের বাড়ি ছিল ওখানে।

আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন শচীপতিবাবু,—তোমার বাবার নাম কী?

আব্বার নাম বলেছিল শামসুল। শচীপতিবাবুর মুখচোখের চেহারা এবার নরম হল। কিছুটা সহজ গলায় বললেন,—ও, তুমি খলিফা সাহেবের নাতি।

সেকালে, অর্থাৎ তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে আমাদের সেই জেলা-শহরে খলিফা সাহেব বললে একডাকে সবাই চিনতো বাবন খলিফাকে। নামজাদা দর্জি। শহরের উপর তিনটে বড় বড় দর্জির দোকান। একটা নতুন বাজারে। একটা পুরনো বাজারের পাশে কাঠপট্টি রোডে। আর একটা আমাদের স্কুলের সামনে রাস্তার ওপারে। আমাদের ক্লাশঘরের জানালা দিয়ে ওদের দোকানের সাইনবোর্ড দেখা যেত। মস্ত সাইনবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে শুধু শামসুলের দাদুর নামটা লেখা। বাবন

খলিফা। আর কিছু নেই। এটাই আমাদের কাছে অন্যরকম লাগত। অন্যসব দোকানের সাইনবোর্ডে কত কী লেখা থাকে। উত্তমরূপে অমুক করা হয়, তমুক করা হয়, পরীক্ষা প্রার্থনীয় ইত্যাদি। আর শামসুলদের তিনটে দোকানের তিনটে সাইনবোর্ড জুড়েই বড় বড় অক্ষরে শুধু ওই একটা নাম। বাবন খলিফা। আমাদের স্কুলের সামনে দোকানঘরের পেছনে ওদের বাড়ি। আটচালা টিনের ঘর। তিন-চারখানা ঘর। তার মধ্যে দুটো দোতলা। যৌথ পরিবার। দুই চাচার ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেকগুলি ভাইবোন। শামসুলদের দুই চাচা দুই বাজারের দুটো দোকানে বসতেন। এই দোকানটা ওর আব্বা দেখাশোনা করতেন। চারটে সেলাইকল নিয়ে চারজন কারিগর কাজ করতো। আর শামসুলের আব্বাকে দেখতুম নিচু একটা তক্তপোশে লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে বসে তালপাতার পাখা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছেন। কাঁচাপাকা চাপদাড়ি, গোঁফ কামানো, মাথায় কদমছাঁট চুল। সবসময় মুখে পান। ফরসির নলে মুখ দিয়ে গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক টানতেন আর মধ্যে মধ্যে হাঁক দিতেন,—ওরে আবু, আবু রে—

কখনো কখনো সেই হাঁক আমাদের ক্লাশঘর থেকেও শোনা যেত।

আবু ছিল দোকানের চাকর, তামাক সেজে আনত, ফাইফরমাস খাটত।

বাবন খলিফাকে আমরা কখনো চোখে দেখিনি। শামসুলের মুখেই শুনেছিলুম তিনি খুব বুড়ো হয়ে গেছেন। আশীর উপর বয়স। রহমতপুরে দেশের বাড়িতেই থাকতেন। আমরা বোধহয় ক্লাশ এইটে পড়ার বছর তিনি মারা গিয়েছিলেন। তখন হিটলারের যুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে। সেই প্রথম দিন শচীপতিবাবু শামসুলকে আরো বলেছিলেন,—পায়জামা পাঞ্জাবি পরে ক্লাশে আসবে না, স্কুলের য়ুনিফর্ম পরে আসতে হবে। আমাদের স্কুলের পোশাক ছিল খাকি হাফপ্যাণ্ট আর সাদা হাফশার্ট। সব ওই বাবন খলিফার দোকানের তৈরী। শামসুল জবাব দিয়েছিল,—জী।

—কখনো জিজ্ঞেস না করে, অনুমতি না নিয়ে ক্লাশে ঢুকবে না।

—জী।

—অত পাউডার মাখবে না, আর আতর মেখে ক্লাশে আসবে না।

এতক্ষণে আমরা বুঝতে পারলুম শামসুলের গায়ে আতরের গন্ধ। যে রকম গন্ধ, তাতে দামী আতর বলেই মনে হয়েছিল।

ওদিকে শচীপতিবাবুর সব কথার উত্তরে শামসুলের এক জবাব,—জী। অর্থাৎ হ্যাঁ।

শেষকালে হুকুমজারি করেছিলেন শচীপতিবাবু,—আজ তুমি বাড়ি যাও, আজ তোমার ছুটি, কাল থেকে ঠিক সময়ে আসবে, যেভাবে বললুম সেইভাবে আসবে, আজ চলে যাও।

বইখাতা নিয়ে আবার সেই নির্বিকার ভঙ্গীতে চলে গেল শামসুল।

পরের দিন থেকে ঠিক সময়ে ক্লাশে আসতে শুরু করল। আমাদের মতই খাকী হাফপ্যাণ্ট, সাদা হাফশার্ট পরে আসতো। স্কুলের সামনেই ওদের বাড়ি। রাস্তার এপার-ওপার। সুতরাং একদিনও লেট হত না। একদিনও কামাই করত না।

শচীপতিবাবুর কথামত পাউডার মাখত না, আতরও নয়। তবে চোখে সামান্য সুর্মা লাগাত

আর মধ্যে মধ্যে দুই কানের ভাঁজে আতরমাখা তুলো গুঁজে আসত। আমরা সেই সুগন্ধি তুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি করতুম।

ক্লাশের চল্লিশটা ছেলের মধ্যে বয়সে সকলের বড় আর সবচেয়ে লম্বা ছিল বলে ওকে ফুটবল টিমের গোলকীপার করেছিল বিনোদ। বিনোদ পাল ছিল আমাদের ফুটবলটিমের ক্যাপ্টেন। প্যাশের বাণীপীঠ স্কুলের ফাইভের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচের দিন আমরা দুটি গোল দিলুম। আমি ব্যাকে খেলতুম। গোলকীপার শামসুল। বিনোদ দ্বিতীয় গোলটি দেবার পর শামসুল নেচেকুঁদে কাদাভর্তি মাঠে গড়াগড়ি খেল। তারপর একতাল কাদা তুলে আমার মাথায় মুখে মাখিয়ে দিল। টুকরো টুকরো অনেক ছবি। অনেক স্মৃতির ভিড়।

ক্লাশ সেভেনের বছর মনে আছে, আমাদের সেই মফস্বল শহরে সুভাষচন্দ্র এলেন। দেশগৌরব বসু। তখনো তিনি নেতাজী হন নি।

আমরা সব ভলান্টিয়ারের দলে নাম লেখালুম। আমি, শামসুল, বিনোদ, লেদু, গোবিন্দ, মাখন। দাদাদের পেছন পেছন ঘুরছি। ফাইফরমাস খাটছি। পোস্টার সাঁটছি, ফেস্টুন টানাচ্ছি, তোরণ সাজাচ্ছি। কটা দিন খুব হইচই উত্তেজনা। বাণীপীঠ স্কুলের মাঠে মস্ত মিটিঙ হল। মনে আছে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বাণীপীঠ স্কুলের হেডমাস্টার বৃদ্ধ রসরঞ্জনবাবু বক্তৃতা দিতে উঠে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলেছিলেন,—বাঙলা-মা-র নস্থ-উ। সুভা-ষ বহু। নস্থ অর্থাৎ আদরের ছেলে। তিরিশ-পয়ত্রিশ বছর আগে বরিশাল জেলায় আদরের ছোট ছেলেকে নস্থ বলে ডাকত। আজকাল হয়েছে, জানি না।

সে বছর শামসুল ওদের দোকানঘরে সুভাষচন্দ্রের একখানি ছবি টানাল। কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র। শাদা ধুতি চাদর, মাথায় গান্ধীটুপি।

তারপর ক্লাশ এইট। আগেই বলেছি, সে বছর শামসুলের দাদু মারা গেলেন আর হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করলেন। শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

ক্লাশ নাইনে পড়ার বছর একদিন ক্লাসে এসে দেখি দারুণ উত্তেজনা। কী খবর? না শামসুলের বিয়ে। আমাদের সকলের বয়সই চোদ্দ-পনেরোর ঘরে। শামসুল কিছু বড়। ওর বয়স ষোল-সতেরো। বারো-তেরো বছরের একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে শামসুলের। এই আশ্চর্য খবরে সেই কিশোর বয়সে অদ্ভুত আনন্দ, বিস্ময়, মুগ্ধতা, উত্তেজনার নেশায় আমরা যেন মেতে উঠেছিলুম। হই-হই করে উপহারের জন্য চাঁদা উঠল। কয়েকখানা গল্পের বই আর একজোড়া ফাউন্টেন পেন কেনা হয়েছিল। বউ নিয়ে বাড়ি এল শামসুল। বিকেলে আমরা নিমন্ত্রণ খেতে গেলুম। খুব আপ্যায়ন করেছিল আমাদের। তখন গ্রীষ্মকাল, গায়ে গোলাপজল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করেছিল। আতরমাখা তুলো দিয়েছিল। খেতে দিয়েছিল কলা, শশা, তরমুজ, আম, সিঙ্গি, সন্দেশ, রসগোল্লা, দই। আর বরফ-দেয়া সরবৎ, ডাবের জল। যার যত খুশি খাও। গেলাসের পর গেলাশ। তারপর মিষ্টিমশলা-দেয়া মিঠে পান। খুব আনন্দ করেছিলুম। হাসি-ঠাট্টা-ইয়ার্কি, সব কিছু হল। কিন্তু শামসুলের বউ-এর দেখা পেলুম না। আলাপ হওয়া তো দূরের কথা। ওদের বাড়িতে পর্দাপ্রথার খুব কড়াকড়ি। মেয়েরা বেশী বাইরে আসতো না। কখনো এলেও, আগাগোড়া বোরখা-ঢাকা। পরের দিন আমরা

শামসুলকে ক্লাশে ধরলুম,—কি রে, তোর বউ দেখালি না?

—দেখাব।—আমতা আমতা করে জবাব দিয়েছিল শামসুল,—আর কয়েকটা দিন যাক, এখন নতুন বউ, বাড়ির সবাই চোখে চোখে রাখছে, একটু পুরনো হোক—তখন দেখাব। কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই দেখলুম, কোনদিন যা কখনি শামসুল, নতুন বউএর টানে তাই আরম্ভ করল। ক্লাশ কামাই করতে শুরু করল। বরাবরই শৌখিন ছিল। এখন ওর আতরমাখা, স্নো-পাউডার ঘষার বহর আরো বেড়ে গেল। ক্লাশে এসে লাস্ট বেঞ্চে বসে ঝিমোত। রাতে ভাল ঘুম হয় না। এই নিয়ে আমরা ঠাট্টা করতুম,—কেন রে, ঘুম হয় না কেন?

—খুব গরম, গরমের জন্য ঘুমুতে পারি না।

—আমরা সবাই পারি, তোর এত কিসের গরম রে? মাখনের মুখে মজা-দেখার হাসি।

—ওর শরীর গরম। বিনোদের মন্তব্য,—বুঝিস না, দেহের গরমে ঘুমুতে পারে না, খুব করে ডাবের জল খাবি, বুঝলি শামসুল, শরীর ঠাণ্ডা থাকবে।

আমরা সবাই হাসতুম। শামসুলও লাজুক মুখে হাসত।

কোন কোন দিন প্রথম চার পিরিয়ড কোন রকমে কাটিয়ে টিফিনে বাড়ি চলে যেত। আর আসত না। কয়েকদিন পরে ক্ষেত্রবাবুর নজরে পড়ে গেল। আমাদের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ক্ষেত্রনাথ গুহ। বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারা বটে, কিন্তু জবরদস্ত কড়া মেজাজের মানুষ। থার্ড পিরিয়ডে আমাদের ক্লাশ নাইনে অঙ্ক কষাতেন। অন্য ক্লাশেও দু-একটা পিরিয়ড নিতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় একখানি বেত হাতে নিয়ে সারা স্কুলময় গুটগুট করে ঘুরে বেড়াতেন। কোন্ ছেলে দুষ্টুমি করছে, কে ক্লাশ পালাচ্ছে, ছেলেরা ঠিকমত জল পাচ্ছে কিনা, ক্লাশ নোংরা করছে কিনা, দেয়ালে কেউ কিছু খারাপ কথা লিখল কিনা, সব তদারক করে বেড়াতেন। এই ক্ষেত্রবাবু একদিন শামসুলকে পাকড়াও করলেন।

—ক'দিন ধরে লক্ষ্য করছি, তুই টিফিনে বাড়ি চলে যাস, আর আসিস না, ব্যাপারটা কী?

—আজ্ঞে, দোকানে বসতে হয়, আব্বা ওসময় থাকেন না।

কথাটা ঠিক। শামসুলের এক চাচা দেশে গেছেন। সেজন্য কিছুদিন ধরে রোজ শেষ দুপুর থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কাঠগড়ি রোডের দোকানে গিয়ে বসতে হত শামসুলের আব্বাকে। এছাড়া মধ্যে মধ্যে কোর্ট-কাছারিতেও যেতে হত। ওদের দেশের বাড়ির জায়গা জমি সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমার তদ্বির করতে যেতেন। কিন্তু ওসব ওজর ক্ষেত্রবাবুর কাছে খাটবে না।

—তাহলে দোকানেই বসিস, ইস্কুলে আসার দরকার নেই। তোর আর লেখাপড়া হবেও না। গুরুবাক্য অমোঘ। ক্ষেত্রবাবুর কথাটা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল।

শামসুলের আর লেখাপড়া হয়নি। ওই ক্লাশ নাইনেই পড়াশোনায় ইস্তাফা দিয়ে পাকাপাকি দোকানে বসতে শুরু করেছিল। কিন্তু তার আগে বিয়ের প্রায় মাস দুই পরে আমাদের বউ দেখিয়েছিল।

বাড়ির লোকেরা কেউ টের না পায় গোপনে বউএর মুখ দেখতে হবে। আষাঢ় মাস। গ্রীষ্মের ছুটির পর স্কুল খুলেছে। শামসুলদের বাড়ির পেছনে খিড়কির পুকুরে চারপাশ ঘিরে আম-জাম-

জামরুল-নারকেলের বাগান। টিফিনের সময় সেই বাগানে জামরুল গাছের নিচে আমরা পাঁচজন জুটেছি। আমি, বিনোদ, গোবিন্দ, মাখন, ভুলু। ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। কাছে পিঠে কেউ নেই। কাছাকাছি দুটো গাছে মুক্তোর মত থোকা থোকা জামরুল ঝুলছে। মাখন গাছে ওঠার তোড়জোড় করছিল। গাছে উঠে ডাল ঝাঁকাবে। আমরা তলায় কুড়োবো। বারণ করল শামসুল।

—গাছে ওঠার দরকার নেই, আঁকশি এনে দিচ্ছি। বাড়ির ভেতর কাকে কী যেন বলে এল। একটু পরেই দেখি খিড়কির দোর দিয়ে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। আগাগোড়া বোরখা-ঢাকা। একহাতে লম্বা আঁকশি আর একহাতে একটি ছোট বেতের ধামা। ফর্সা দুই হাতে সবুজ কাঁচের চুড়ির গোছা, রুপোর চুড়ি। খালি পায়ে রুপোর চুটকি, পায়ের কাছে শাড়ির সবুজ পাড়। পুকুর-পার ঘুরে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। ধামা আর আঁকশিটা ঘাসের উপর নামিয়ে রেখে শামসুলের পাশে দাঁড়াল। জামরুল গাছটার কাছাকাছি আমরা পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছি। একদম চুপচাপ। শামসুল বললো,—কি রে, কথা বলছিস না যে, সব চুপ করে গেলি কেন?

কী বলবো কিছু বলতে পারছি না। বোরখার জালির ভেতর দিয়ে একজোড়া কালো চোখ আমাদের লক্ষ্য করছিল, এটুকু বুঝতে পারছি। আর কিছু বোঝার উপায় নেই। হঠাৎ এক কাণ্ড করল শামসুল। আচমকা বোরখার মুখের ঢাকাটা একটানে তুলে দিয়ে বললো,—এই দ্যাখ, আমার বউ। আমরাও হতভম্ব। মেয়েটিও তথৈবচ। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। একখানি গোলগাল ফর্সা মুখ, চোখে সুর্মা, নাকে নাকফুল। কয়েক পলকমাত্র দেখতে পেলুম। তারপরই মেয়েটি জিভ কেটে এক ঝটকায় শামসুলের হাত ছাড়িয়ে একরকম ছুটে পালাল। পরক্ষণেই বাড়ির ভেতর থেকে শামসুলের আব্বার বাজখাঁই গলা শুনলুম,—ওরে আবু, দ্যাখ তো কারা ওখানে। আর দাঁড়াই আমরা! জামরুল খাওয়া মাথায় উঠল। যে যেদিকে পারলুম চোঁচা দৌড়।

আগেই বলেছি, ক্লাশ নাইনেই স্কুল ছেড়েছিল শামসুল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল না। ওদের দোকানঘরটি দুপুরে আমাদের ক্লাশ পালিয়ে আড্ডার জায়গা হল। সে সময় শামসুলের আব্বা থাকতেন না। কারিগরেরাও বাড়িতে খেতে যেত। কাজের চাপ কম। সুতরাং দুপুরের দু-তিন ঘণ্টা আমাদের অবাধ আড্ডার কোন ব্যাঘাত ঘটত না। বড় দোকানঘরটির মাঝে আরেক-খানি ছোট ঘর ছিল। সেখানে একটি তক্তাপোশ, দুখানি চেয়ার আর লম্বা দুটি আয়না ছিল। দর্জির দোকানের ট্রায়াল রুম। আমরা সেই ঘরে প্রথম সিগারেট টানতে শিখেছিলুম। লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে আমরা যুবক হয়ে উঠেছিলুম।

স্কুলের পরীক্ষা পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হলুম। ব্রজমোহন কলেজ। কলেজে আমাদের ইংরেজি পড়াতেন কালো রঙের শান্তশিষ্ট এক অধ্যাপক। তিনি কোথাও বিশেষ যেতেন না। কারো সঙ্গে তেমন মিশতেন না। কলেজের কোন হইচই গোলমালের ত্রিসীমানায় তিনি থাকতেন না। খুব নম্র স্বভাবের লাজুক প্রকৃতির মানুষ। তাঁর নাম জীবনানন্দ দাশ।

যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ, এর মধ্যে কলেজের বছরগুলি পেরিয়ে এলুম। সামনে স্বাধীনতার সাফল্য। দিল্লীতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হল। সেই সরকারের মন্ত্রিসভায় মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে যে পাঁচজন যোগ দিলেন, তাদের মধ্যে আমাদের জেলা শহরের উকিল মণ্ডলমশাইর নাম দেখে আমরা

খুব অবাক হয়েছিলুম। যাকে আমরা রোজ কালো কোট গায়ে রিকশা চেপে কোর্টে যেতে দেখি। কিম্বা কতদিন মক্কেলহীন বৈঠকখানাঘরে বসে হাতপাখা নেড়ে হাওয়া খেতে দেখেছি। সেই মণ্ডলমশাই দিল্লীতে গিয়ে নেহেরু-লিয়াকত আলীর পাশে বসে মন্ত্রিত্ব করবেন। একথা ভাবতেই আমাদের যেন কেমন লেগেছিল। সে সময় আরো একটি ব্যাপারে খুব অবাক হয়েছিলুম।

একদিন শামসুলের দোকানে আড্ডা দিতে গিয়ে দেখি সুভাষচন্দ্রের ছবির পাশে জিন্নাসাহেবের ছবি। বেশ জমকালো ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। সাইজেও বড়।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম,—এ কি রে শামসুল? হঠাৎ এই ছবি?

—কায়েদে আজাম জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ। গম্ভীর গলায় জবাব দিয়েছিল শামসুল।

—সে কি রে, তুই না নেতাজীর ভলাণ্টিয়ার ছিলি?

—তখন ছেলেমানুষ ছিলুম, হুজুগে মেতেছিলুম, কিছু বুঝতুম না।

—তুই না নেতাজীর ভক্ত?

—আমি এখনো নেতাজীর ভক্ত, নেতাজী ফিরে এলে হয়তো দেশের চেহারা অন্যরকম হত, হয়তো আমরা পাকিস্তান চাইতুম না, কিন্তু কী হতে পারতো, তা নিয়ে আজ আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, এখন আমরা কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, পাকিস্তান চাই, আমাদের বাঁচার জন্যই পাকিস্তান দরকার, নেহেরু নিশ্চয় ভালমানুষ, কিন্তু তাঁর ভালমানুষি আমাদের বাঁচাতে পারবে না, সত্যি বলতে কি, তোমাদের ওই প্যাটেলসাহেবকে আমরা বিশ্বাস করি না। বেশ উত্তেজিত শামসুল। ওর মুখে ওরকম কথা আগে শুনিনি কোনদিন। কী আর বলবো! আবাল্য বন্ধু আমরা। [illegible] করলে তিক্ততা বাড়বে। তাই চুপ করে গেলুম। দেশ ভাগ হয়ে গেল। দলে দলে লোক দেশছাড়া হতে লাগল।

শান্তি মিছিলে শামসুলের পাশাপাশি হেঁটে হেঁটে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচিয়েছিলুম, 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই। পাকিস্তানে ভয় নাই।' কিন্তু ভয় না থাকলেও ভরসা ছিল না। কয়েকমাস পরে পাকাপাকি কলকাতা চলে এসেছিলুম।

তারপর প্রায় পঁচিশ বছর শামসুলের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। আজ এই শীতের সকালে শামসুলের ছোটভাই মুকুলকে দেখে সব মনে পড়লো। চার-পাঁচটি ভাইবোনের উপরে সবার বড় ছিল শামসুল। নকুলকে খুব ছোট দেখেছি। স্কুলের নিচু ক্লাশে যাতায়াত করত। ওর সম্বন্ধে আর কিছু মনে নেই। এতদিন পরে নিজে এসে পরিচয় না দিলে চিনতে পারতুম না।

বনগাঁ লোকাল লেট করে প্লাটফর্মে এল। এখন সওয়া ছ'টা। হাতঘড়িতে দেখলুম পঁচিশ মিনিটও হয়নি, এর মধ্যে আমি পঁচিশ বছর পেছনে ঘুরে এলুম।

আরও মিনিট পনেরো পরে সাড়ে ছ'টায় ট্রেন ছাড়ল। মুকুল ততক্ষণে গুছিয়ে আমার পাশে বসেছে। আমি বাঁ ধারে জানালার পাশে। আমার ডানপাশে মুকুল। তারপর ওর তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তারপর ওর বউ। তারপর ওর এক চাচা, চাচী। মুখোমুখি চাচার ছেলে, বউ, বউএর কোলে বাচ্চা। তিনপুরুষের সংসার। প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছিল। এখন দেশ স্বাধীন হতে আবার ফিরে যাচ্ছে। কথায় কথায় মুকুল জানাল, ওর শ্বশুরবাড়ি পার্কসার্কাস। শ্বশুরের

দর্জির দোকান। সেখানেই ওরা ছিল গত কয়েকমাস।

শামসুলের খবর জিজ্ঞেস করলুম। আস্তে আস্তে সব খুলে বললো হুরুল। পাকিস্তান কায়েম হবার বছর দুয়ের মধ্যেই মোহভঙ্গ হয়েছিল শামসুলের। মাতৃভাষা, মুখের ভাষাই তার মনোভাব বদলে দিয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিল। প্রথমে আওয়ামী মুসলিম লীগ, পরে আওয়ামী লীগের সক্রিয় সদস্য। গতবছর, একাত্তরের মার্চমাসে ইয়াহিয়া খাঁর মিলিটারি নামল। গা-ঢাকা দিয়েছিল শামসুল। পুলিশের গোয়েন্দারা তিন মাসের মধ্যে তার পাত্তা করতে পারেনি। শেষে মরীয়া হয়ে উঠেছিল। মিলিটারির লোকেরা এসে শামসুলের দুই ছেলে রফিকুল আর জিয়াউলকে ধরে নিয়ে গেল। রফিকের বয়স চোদ্দ-পনেরো। জিয়াউলের দশ। মিলিটারির মেজর হুকুমজারি করে গেলেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শামসুল ধরা না দিলে ছেলেদের আর ফেরত পাওয়া যাবে না। খবর পেয়ে সেদিন বিকেলে বাড়ি এসেছিল শামসুল। বলতে বলতে হুরুলের গলা ভারী হয়ে এল। চোখের পাতা ভিজে উঠল,—আপনি তো জানেন কি রকম শৌখিন মানুষ ছিলেন, দামী শিল্কের পাঞ্জামা, পাঞ্জাবি পরে ছিলেন, সারা গায়ে আতর মেখেছিলেন, তারপর সকলের কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে, সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে একটা রিকশা ডেকে মিলিটারি ক্যাম্পে চলে গেলেন।

শামসুলকে হাতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে দুটিকে ছেড়ে দিয়েছিল মিলিটারিরা।

তারপর সন্ধ্যার সময় আরো কয়েকজনের সঙ্গে একটা দেয়ালের সামনে শামসুলকে দাঁড় করিয়ে একঝাঁক গুলি চালিয়েছিল।

শামসুলের সেই রক্তাক্ত শরীরের দৃশ্য আমি কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু নিশ্চিত জানি সেই আষাঢ়ের ম্লান সন্ধ্যায় সেখানে তখন রক্তের গন্ধ, বারুদের গন্ধ ছাপিয়ে আতরের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল।

বাঙালী কৃষক ও বাঙালী রেনেসাঁস : ১৮০০-১৮৫০

রমাকান্ত চক্রবর্তী

১৮০০ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়টি ছিল তথাকথিত বাঙালী রেনেসাঁসের আদিপর্ব। বাঙলাদেশের কৃষক সম্পর্কে বাঙালী রেনেসাঁসের নেতাদের চিন্তাধারার মৌলরূপ এ সময়ে তাঁদের কথায়, কাজে, এবং রচনায় প্রকাশিত হয়। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উল্লেখ করা প্রয়োজন। পলাশীর যুদ্ধের (খ্রীঃ ১৭৫৭) আগে থেকেই কিছু সুযোগ-সন্ধানী বাঙালী ইংরাজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের সুবিধা করতে থাকে। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে থেকে এদের কেউ বা হলো বানিয়ান, কেউবা দেওয়ান, কেউবা ইজারাদার-জমিদার, কেউবা মুন্সী, কেউবা তালুকদার। বংশ-কৌলীন্য এদের ছিল না। তাই অর্থ-কৌলীন্যকে এরা ক্রমশ বড় করে তুলল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এদের একরোখা উন্নতির যুগ। অর্থাৎ অনিবার্য ভাবে এদের সামাজিক ক্ষমতা বেড়ে যায়। তাই একাধিক সহকর্মীর বিরোধিতা সত্ত্বেও কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে এইসব 'নবরঙ্গকুলপতি' 'খাজনা-পরিদর্শক'দের বানালেন জমির মালিক, এবং দেশের চাষীদের হর্তাকর্তাবিধাতা। যদিও সরকারি নথিপত্রে কোন প্রমাণ নেই, তবুও সন্দেহ হয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করার আগে কর্নওয়ালিস প্রতিনিধিস্থানীয় দেশী দালালদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। তার কিছু পরোক্ষ প্রমাণ অবশ্য আছে। টিপু-সুলতানের পরাজয়ের পরে কর্নওয়ালিস কলকাতায় ফিরে এলে কলকাতার ১৬২ জন প্রধান 'নেটিভ' তাঁকে বাংলা ও ফারসিতে মানপত্র দিয়েছিলেন। কর্নওয়ালিসের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ ছিল, এই মানপত্র থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। [*Selections from Calcutta Gazettes*, Vol. III, Ed. Seton-Karr, Pp. 342-44] দ্বিতীয়ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম হওয়ার পরে সরকার সে বিষয়ে জমিদারদের অভিমত জানতে চেয়েছিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আসল উদ্দেশ্য ছিল সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব সুনিশ্চিত এবং সুনির্দিষ্ট করা। কিন্তু বাঙলার নব্যধনীদের সহযোগিতা ছাড়া তা করা অসম্ভব ছিল। শাসনযন্ত্র ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ তখন নড়বড়ে। কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল এ-দেশের টাকা এ-দেশে সাম্রাজ্য বিস্তারে খরচ করা। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর রচিত অর্থনৈতিক ইতিহাসে একাধিকবার এ কথা বলেছেন; ভিগ্‌বি ও দাদাভাই নওরজী তাঁর এ বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন। এ কথার যাথার্থ্য এখনও অবিচলিত। টাকাটা যখন এখান থেকেই আসবে, তখন এখানকার নেটিভ মাতব্বরদের হাতে রাখা কর্নওয়ালিস যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রায়তের কথা ভেবে করা হয় নি। কোম্পানির সঙ্গে রায়তের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। পরশুরাম-বর্ণিত 'পাপ তো হবে কাসেম আলী'র নীতি অবলম্বন ক'রে কোম্পানি কৃষকদের শোষণ করার কাজে জমিদারদের নিয়োগ করল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের সঙ্গেই হয়;

অর্থাৎ কোম্পানির হাত গরিবের রক্তে রাঙা হবে না। কৃষকদের শোষণ করবে জমিদার; কোম্পানি তার সিংহভাগ পাবে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, কোম্পানি 'বাহাদুরের' দালাল জমিদাররা অশেষ যোগ্যতার সঙ্গে এই নোংরা কাজ করেছিলেন। পেয়েছিলেন প্রচুর বখরা। বে-আইনি খাজনা আদায়, ১৭৯৯-র পর থেকে কিস্তির দিনে খাজনা দিতে না-পারলে প্রজার সম্পত্তি এবং শস্যের ভাগ ক্রোক করা, খাজনা পেলেও তাকে নানা ছুতোয় চাষের জমি থেকে উৎখাত করা, তাকে মহাজনের খপ্পরে ঠেলে দেওয়া, ক্রীতদাস করা, এসব জমিদাররা নির্ভয়ে করেছিলেন। বিক্রমপুর অঞ্চলে কৃষকদের আত্মবিক্রয় এক সময় একটি প্রথা হয়ে যায়। সেখানকার কালীপাড়ার জমিদার-বংশে এক সময় ৩০০ ক্রীতদাস প্রতিপালিত হতো। ১১৯১ বঙ্গাব্দের একটি দলিলে দেখা যায়, মাত্র ৩১ টাকা পেয়ে একটি চাষী স্ত্রী-পুত্র সহ নিজেকে কালীপাড়ার বাঁড়ুয্যেদের কাছে বিক্রি করেছিল। [হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত "বিক্রমপুর" (২), পৃ: ১০-১১] কবিগান, বাই-নাচ, টপ্পা ও আখড়াই গান, বুলবুলির লড়াই, পক্ষীর দল, পূজা-পার্বণ এবং জাতিভেদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, চরম বিলাসী, অলস এবং ভাঁড় ও উমেদার পরিবৃত সমকালীন 'জমিদার' বাবুদের কৃষকপ্রীতির একটিও বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শন নেই। 'বাকি মনের সুখে হাস্যমুখে কে কার রাখে খোঁজ', এই ছিল তাদের মনোভাব। অনেক পরে হুতোম প্যাঁচা লিখেছিলেন, 'বাঙলার নবাধনীরা ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরতেন; মুক্তাভস্মের চুন দিয়ে পান খেতেন; ভেঁপু বাজিয়ে গঙ্গাস্নানে যেতেন, এবং কুকুরের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করতেন। রাঢ় অঞ্চলের জমিদারদের জীবনযাপনের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন পঞ্চানন মণ্ডল, লিখেছেন: 'জলেশ্বরের ধোপাই ধুতি পরিয়া মন্দিরা সহযোগে থানার শেষে কুরসিতে বসিয়া সালমোতে মাথা তামাক টানিতে টানিতে আফিমের মৌতাতে গুমোট বরষায় ঝিমাইতেছেন, এই চিত্র দুর্লভ নহে।' ["চিঠিপত্রে সমাজচিত্র" (১), পৃ: ২০০-২০১]

কিন্তু আর্তজনের সখা ছিল না বললে ভুল হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম হবার আগেই রামপ্রসাদ ধনীদরিদ্রের ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের বিরুদ্ধে মা কালীর কাছে জোরালো ভাষায় প্রতিবাদ জানান। তিনি লিখেছিলেন, 'কারো অঙ্গে শাল দোশালা, ভাতে চিনি দই/আবার কারো ভাগ্যে শাকে বালি, ধানে ভরা খই/কেউ বা বেড়ায় পাল্‌কি চড়ে, আমি বোঝা বই/ওমা! আমি কি দিয়েছি তোমার পাকাধানে মই'। রামপ্রসাদের বহু 'সাধন-সঙ্গীত'-এ মামলা-মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হওয়ার ইঙ্গিত আছে, 'যম'-তুল্য শাসকদের নিপীড়ন কৌশ রূপকের ভাষায় অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। গ্রামের কবিরাও এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন। জমিদারি উৎপীড়ন ও সর্বহারা চাষীর কষ্ট অষ্টাদশ শতকে রচিত বহু লোকগীতিতে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু এ নিবন্ধে তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। [ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সংকলিত "প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা", চার খণ্ড।]

বাঙলা গদ্য-ভাষার অন্যতম স্রষ্টা উইলিয়াম কেরী রচিত "কথোপকথন" (১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ) নামক গ্রন্থে কৃষকদের দুর্গতির একাধিক বর্ণনা দেখা যায়। মহাজন-আসামি, মক্কুরের কথাবার্তা, খাতক-মহাজনি, সাধু-খাতকি, এবং জমিদার-রাইয়ত শীর্ষক অধ্যায়গুলিতে এসব বর্ণনা আছে।

গরিব কৃষককে মহাজন বলদ বিক্রি করে ধার শোধ করার উপদেশ দিচ্ছে, ধনী কায়স্থ মজুরকে দিয়ে কাজ করিয়ে তাকে তার প্রাপ্য মজুরি দিচ্ছে না; কিস্তির দিনে খাজনা দিতে অসমর্থ চাষী সাহু-মহাজনের কাছে যথাসর্বস্ব বন্ধক রেখে মাত্র ১০ টাকা ধার পাচ্ছে; মালগুজারির টাকা দিতে না পারায় নির্দয় জমিদার প্রজাকে কয়েদে পাঠাচ্ছে; জমাদার সেই প্রজাকে ধরে বলছে, চল্ বে চল্! প্রজা তাতে আপত্তি করলে জমিদার বলছে, যা বেটা তুই। আমার জমি থাকিলে অনেক প্রজা পাইব। কেরী প্রসঙ্গে স্মরণীয়, জমিদারের অত্যাচার এবং প্রজাদের কষ্টের বিবরণ মিশনারিদের জানা ছিল। তাঁরা "হিন্দু" জমিদারদের কবল থেকে দরিদ্র প্রজাদের খ্রীষ্টান ধর্মের 'স্বর্গে' আকর্ষণ করার জন্য খুব চেষ্টা করেন। এইরূপ প্রচেষ্টার বহু বিবরণ পাওয়া যাবে লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির পাদরি জর্জ গোগারলি রচিত *The Pioneers* (London, 1871) নামক গ্রন্থে।

কেরী সাহেবের প্রায় বারো বছর পরে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার "প্রবোধচন্দ্রিকা"র একটি অধ্যায়ে বাঙালী চাষীর দারিদ্র্য বর্ণনা করেছিলেন। অসাধারণ এই বর্ণনা; সমকালীন কোনো বাঙলা রচনায় এমন বর্ণনা দেখা যায় না। অনেক পরে "সংবাদ প্রভাকর", "বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর", "তত্ত্ববোধিনী" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ মৃত্যুঞ্জয়ের বর্ণনাকে তথ্যে ও ভাষার ঐশ্বর্যে অতিক্রম করতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ। লক্ষণীয়, মৃত্যুঞ্জয় নিজের ভাষায় বর্ণনা করেননি। একটি বিপন্ন, দুর্গত, এবং দরিদ্র কৃষকবধূর নিজের ভাষায় কৃষকজীবনের দুঃখ, বঞ্চনা ও জমিদারি শোষণের রূপ উদ্ঘাটিত করেছেন তিনি। স্বল্পপরিসর এই নিবন্ধে ইচ্ছা থাকলেও মৃত্যুঞ্জয়ের এই রচনাটির পূর্ণ উদ্ধৃতি সম্ভব নয়। কিছু কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি:

(ক) যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়ি ধানের মুড়ী ও মটর, মসুর, শাক-পাত, শামুক, গুগলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি।··· খুঁদ-কুঁড়া ফেণ আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সেদিন তো জন্মতিথি। কাপড় বিনা কেয়ো পাচা ঠুকরিয়া যায় তেল বিহনে মাতায় [মাথায়] খড়ি উড়ে··· বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাইনা···

(খ) এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা শুকা হইলেও আপন রাজস্বের কড়া গণ্ডা ক্রান্তি বটধুল ছাড়েনা। এক আদ দিন আগে পিছে সহে না··· সুদ দাম দাম বুঝিয়া লয় কড়া কপর্দকও ছাড়েনা।

(গ) যদি দিবার যোত্র না থাকে তবে সানা মোড়ল পাটোয়ারি ইজারাদার তালুকদার জমিদারেরা পাইক পেয়াদা পাঠাইয়া হাল যোয়াল ফাল হালিয়া বলদ দামড়া গরু বাছুর বকনা কাঁথা পাত্‌রা চুপড়ী কুলা ধুচনী পর্যন্ত বেচিয়া গোবাড়িয়া করিয়া পিটিয়া সর্ব্বস্ব লয়।

(ঘ) মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারি না।

(ঙ) হে ঈশ্বর! দুঃখির উপরেই দুঃখ! ওরে পোড়া বিধাতা আমাদের কপালে এত দুঃখ লেখিস তোর কি ভাতের পাতে আমিরাই ছাই দিয়াছি।

[ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, "মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী", পৃ: ২৮২-২০]

এই কৃষকবধূটি মনগড়া কথা বলেনি। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে জমিদাররা পঞ্চাশ রকম বেআইনি খাজনা কৃষকদের কাছ থেকে জবরদস্তি করে আদায় করত। থ্যাকার নামক এক অভিজ্ঞ সরকারি কর্মচারী তার উল্লেখ করেছিলেন। [*Fifth Report*, p. 914] দ্বিতীয় দশকে, অর্থাৎ "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" লেখার সমকালে এবং তার অব্যবহিত পরেও, চাষীর অবস্থা ভাল হয় নি। নীলচাষীদের অবস্থা কিছুটা ভাল ছিল। কিন্তু নীলের দাদন তারা যে মোটেই পছন্দ করত না, ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে বুকানন হামিল্টন তা লক্ষ করেছিলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াল্টার হামিল্টন লিখেছিলেন : একজন ঠিকে চাষীর বার্ষিক বেতন ছিল মাত্র ৪ টাকা থেকে ৮ টাকা। ১৭৯৩ থেকে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কৃষির উৎপাদনযন্ত্রের দাম বেড়েছিল শতকরা ৭৫ ভাগ। ১টি গাভী, কিংবা ১টি বলদ কিনতে হলেই ঠিকে চাষীর সারা বছরের আয় নিঃশেষ হয়ে যেত। গ্রামের জলাশয়গুলি যত্নের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। অথচ, বন্যার ভয়ে চাষীরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-বলদ-ছাগল-গরু সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করত। [*Description of Hindostan*. (Delhi, 1971) Vol. I, Chapter on Bengal] ইতিমধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধুপানের লোভে জমিদার-তালুকদার ছাড়াও আরো অনেক অলি জুটেছিল। ইৎমাদার, ঠিকাদার, ইজারাদার, পত্তনিদার, জোতদার, গাঁতিদার, হাওলাদার প্রভৃতি 'দার'-জাতীয় মধ্যস্বত্বোপভোগী ভ্রমরের দল কৃষকদের গায়ে হুল ফুটিয়ে বেশ বড়লোক হয়ে যায়। সরকার-বাহাদুর ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের "অষ্টম রেগুলেশন" বানিয়ে এদের কৃষকশোষণ আইনের আওতায় নিয়ে আসেন।

ওদিকে ব্রিটিশ সিংহের দুর্দান্ত পরাক্রমে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা চিরকালের মত বিবরে প্রবেশ করল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রায় "চিরস্থায়ী" হয়ে উঠল। অমনি এ-দেশের ধনী, সম্ভ্রান্ত ভদ্র-লোকরা শিক্ষাবিস্তারের জন্য, অর্থাৎ ইংরাজি-ভাষার প্রসারের জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তার আগে এঁরা চুপচাপ বসেছিল ; দেখছিলেন, কী হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হল। ক্রমে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে এবং পক্ষে আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল ; স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের জন্য দেখা গেল ব্যস্ততা। ব্রাহ্মধর্মান্দোলন প্রবল হলো ; তার বিরুদ্ধে পয়সাওয়ালা বাবুরা হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করতে থাকলেন। এ-সব আন্দোলনের মধ্যে কৃষকদের কথা শোনা গেল না। কারণ শিক্ষিত, ধনী, এবং সাহেবদের আদুরে বন্ধু বাঙালী বাবুদের কানে তখন রেনেসাঁসের 'পায়ল' বাজছিল।

রাজা রামমোহন রায়, বাঙালী-রেনেসাঁসের জনক কৃষকদের অবস্থার বিবরণ জানতেন। এ বিষয়ে তিনি চিন্তা-ভাবনাও করেছিলেন। কিন্তু রামমোহন-রচনাবলীর বিপুল বিস্তারে রাজস্ব-বিষয়ক তাঁর রচনাসমূহ স্বল্প এবং অসম্পূর্ণ। বাঙলা গদ্যের স্রষ্টারূপে প্রখ্যাত রামমোহন এ-সব লেখা ইংরাজিতেই লিখেছিলেন। তাঁর রাজস্ব-বিষয়ক প্রত্যেকটি রচনা বিলেতে ছাপা হয়। তাঁর সমসাময়িক ভক্তরা এ-সব রচনার বঙ্গানুবাদের প্রয়োজনও অনুভব করেন নি।

তবুও রামমোহনই এ-বিষয়ে নতুন পথ দেখিয়েছিলেন। সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের ফলে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উৎপত্তি হয়, তাকে তিনি-ঐ-সব আন্দোলনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাননি। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে ঐ দৃষ্টিভঙ্গির সম্প্রসারণ তাঁর কাম্য

ছিল। তাঁর সাহসকেও সাধুবাদ দিতে হয় ; কারণ নিজে বাঙালী জমিদার হয়েও তিনি বাঙালী জমিদার শ্রেণীর সমালোচনা করতে ভয় পাননি। অথচ, তিনি নিজে কিভাবে জমিদারি চালাতেন, তা জানা যায় না। তিনি কি 'আদর্শ' জমিদার ছিলেন ? তাঁর জমিদারির প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কই বা কেমন ছিল ?

জমিদারদের প্রজাপীড়নের উপায়গুলো রামমোহন জানতেন। তিনি জানতেন, জমিদাররা বেআইনিভাবে প্রজাদের আইনসঙ্গত অধিকার নষ্ট করে দিচ্ছিল, নিজের সুবিধামত জমির শ্রেণী-বিভাগ করে প্রজাদের ওপরে অতিরিক্ত খাজনার বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছিল, চাষীর সম্পত্তি ইচ্ছামত ক্রোক করছিল। তিনি জানতেন, প্রচলিত আইন এবং সরকার জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করত, প্রজার স্বার্থ নয়। তিনি লিখেছিলেন, "The power of imposing new leases and rents given to proprictors by Reg I and VIII of 1793 and subsequent Regulations have considerably enriched comparatively a few individuals—the proprietors of land—to the extreme disadvantage or rather ruin, of millions of their tenants ; and it is productive of no advantage to the government." [*Paper on the Revenue System of India*, Para 11] সাহসে ভরা কথা, সন্দেহ নেই। তথাপি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল্যায়নে রামমোহনের স্ববিরোধ একাধিক রচনায় সুস্পষ্ট। কিছু দৃষ্টান্ত :

(ক) উপরের উদ্ধৃতিতে তিনি বললেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নতুন ইজারা দেওয়ার অধিকার ও খাজনা আদায় করার অধিকার মেনে নেওয়ার ফলে সরকারের কাছে লাভজনক নয়। কিন্তু আবার বললেন, রায়তোয়ারি বন্দোবস্তের তুলনায় তা বিশেষ লাভজনক। [*The English Works of Raja Rammohan Roy*, ed. J. C. Ghose, Calcutta, 1901, Vol II, P. 100। অতঃপর এই বই শুধু *English Works* নামে উল্লিখিত হবে]

(খ) একবার বললেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির মালিকের অবস্থা ভাল হয়েছে, তাদের সম্পদ বেড়েছে। [*English Works*, P. 68, Q. 36] আবার বললেন, the generality (of land-holders) are by no means so favourably situated as is generally supposed. [*op. cit.* P. 104, No. IV]

দেশের সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে জমিদারদের সম্পদ বৃদ্ধির সম্পর্ক তিনি লক্ষ করেছেন। (*op. cit*, P. 68, Q. 36)

রামমোহনের রাজস্ব-বিষয়ক রচনাসমূহ পড়ে মনে হয়, [op. cit, Pp. 55-105] কৃষকদের দুর্দশা সম্পর্কে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ঐ-ব্যবস্থায় সরকারের লাভ-লোকসান, দেশের সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে কৃষকদের দারিদ্র্যবৃদ্ধি, জমিদারদের অর্থনৈতিক অবস্থা, দেশের উন্নয়নে তাদের ভূমিকা, ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে চিন্তার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সুবিবেচিত এবং স্ববিরোধমুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার আগেই তাঁর অকালমৃত্যু হয়।

তবু না-মেনে উপায় নেই, বাঙালী রেনেসাঁসের প্রথম উল্লেখযোগ্য নেতা রামমোহনই সবার

আগে বাঙালী কৃষকদের দুরবস্থা দূর করার জন্য কিছু কাজের কথা বলেছিলেন। [*Questions and Answers on the Revenue System of India*, Ans. to Q. 34] কৃষকদের আইনমোতাবেক দেয় খাজনার পরিমাণ আর কিছুতেই বাড়ানো চলবে না ; বিচারব্যবস্থাকে কৃষকের স্বার্থের অনুকূলে আনতে হবে ; কৃষকের স্বার্থে জেলার শাসনপর্যায়ে পরিচালক (executive) -ব্যবস্থা ও বিচার-ব্যবস্থার মধ্যে সীমারেখা টেনে দিতে হবে ; [op. cit P. 73, Q. 47] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপকার কৃষকদের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করতে হবে [Ibid, P. 103]—এইসব ছিল তাঁর প্রস্তাব। এখানে উল্লিখিত তাঁর শেষ প্রস্তাবটি ১৮৮৯, ১৮৯২ এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বার বার উত্থাপন করে। রামমোহন কিছু জরুরি সংস্কার সাধনের মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে আরো ব্যাপক ও জোরদার ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন ; তাঁর এই ধ্যান-ধারণা উনিশ শতকের বাঙালী রেনেসাঁস-এর অর্থনৈতিক আন্দোলনের প্রধান অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। তার পরে জমিদারি শোষণের সমালোচনা আরো তীব্র, তীক্ষ্ণ ও ব্যাপক হয়ে ওঠে ; নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনে পরে বাঙালী রেনেসাঁস থেকেই নেতৃত্ব আসে। কিন্তু দেশী জমিদারদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনাই হয়েছে ; অমঙ্গল, কিংবা উচ্ছেদ কামনা করা হয় নি।

কৃষকদের অবস্থা ও দেশের অবস্থা ভাল করার জন্য রামমোহন যে-সব আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন, তাতে একমাত্র ইংরাজদের ছাড়া আর কারু অবস্থাই ভাল হয়নি। রামমোহন বলেছিলেন, ইংল্যাণ্ডেই এ-দেশের প্রয়োজনীয় লবণ তৈরি করা উচিত, এবং এবং সেখানে তৈরি লবণ সস্তা দামে এখানে আমদানি করা উচিত। [J. K. Majumdar, *Rammohun Roy and Progressive Movements in India*, Pp. 467-469] তাঁর উপদেশ অনুসারে বিলেত থেকে সস্তা লবণ আমদানির ফলে প্রায় ছ'লাখ বাঙালী 'মলঙ্গী' (লবণ-কারিগর) বেকার ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়। (N. K. Majumdar, *Midnapur Salt Papers*, P. 146)

এদেশে ইউরোপিয়ানদের জমিদারি করার এবং অবাধে ব্যবসা করার অধিকার আদায়ের জন্য রামমোহন দ্বারিকানাথ ঠাকুর, (রবীন্দ্রনাথ 'দ্বারিকানাথ ঠাকুর' বানান লিখেছেন ; 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ', পৃ ৫৮ দ্রষ্টব্য) প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায় প্রভৃতি জমিদারদের সঙ্গে একজোট হয়ে আন্দোলন করেন। দ্বারিকানাথ-পরিচালিত এবং নীলরত্ন হালদার সম্পাদিত "ধনদূত" পত্রিকায় এই আন্দোলনের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ক্লোনিজেসিয়ন' (!) অথবা 'কলোনাইজেসন্'-এর আন্দোলন। এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় বিলেতে ; এই আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা করার অধিকার রদ করা। [C. H. Philips, *The East India Company*, (1784-1834, P. 287-98] এই আন্দোলনে লণ্ডনের ইংরাজ বণিকদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দ্বারিকানাথ ঠাকুরের এ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার বিষয়টি বোঝা যায়। তিনি সাহেবদের সঙ্গে ব্যবসা করতেন। তাঁর বেলগাছিয়া ভিলায় 'ছুরি-কাঁচার ঝনঝনি' নিয়ে ছড়া পর্যন্ত কাটা হয়েছিল। দ্বারিকানাথ উচ্চবিত্ত দেশীয় লোকদের সঙ্গে ইংরাজদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চেয়েছিলেন। [Kissory Chand Mitra, *Memoir of Dwarkanath Tagore*, Calcutta, 1870, P. 70-74] তিনি নিজেও নীলচাষ

করতেন, নিজেই তা স্বীকার করেছিলেন। [J. K. Majumdar, *op. cit.* Pp. 407-57] লণ্ডন, লিভারপুল, মাঞ্চেস্টার-এর অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থক বিলাতি ব্যবসায়ীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি থাকা অস্বাভাবিক ছিল না। জেরেমি বেন্থাম্-এর ভক্ত রামমোহনও অবাধ বাণিজ্যনীতির দোষ বিবেচনা না ক'রে সমকালীন পরিবেশে তার গুণই দেখেছিলেন। তা-ছাড়া ইংল্যাণ্ডের উদারনীতির সমর্থক রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল ছিল।

কিন্তু 'ক্লোনিজেসিয়ন' আন্দোলন করে তাঁরা ভুল করেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি তাঁরা চেয়েছিলেন। কিন্তু তার সঙ্গে ভূমি- ও রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রশ্নও জড়িত ছিল। সে-প্রশ্নের উত্তর রামমোহন সংক্ষেপে দিলেন। জমিদারি শোষণ বন্ধ করার জন্য, এবং কৃষকদের অবস্থা ভাল করার জন্য সভা করলেন না, সমিতিও গঠন করলেন না ; কিন্তু রামমোহন দ্বারিকানাথ এদেশে অবাধে সাহেবদের বাণিজ্য করার অধিকার ও জমিদারি করার অধিকার দাবি করে সভা করলেন। দ্বারিকানাথ প্রস্তাব আনলেন ; রামমোহন তা সমর্থন করলেন। (J. K. Majumdar, *op. cit*, P. 438) জেরেমি বেন্থামের মতাশ্রয়ী কোন কোন লেখক, যেমন জেমস্ মিল্, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মেনে নিতে পারেননি। (Mill-Wilson, *History of British India*, Vol. V. Pp. 366-75) বলা হয়, রামমোহনও উপযোগবাদী (utilitarian) ছিলেন। কিন্তু সমালোচনা করেও তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মেনে নিয়েছিলেন, তার ওপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। উপনিবেশবাদ-এর পক্ষে আন্দোলন সৃষ্টি করে রামমোহন ও দ্বারিকানাথ বিদেশী সাহেবদেরও ঐ বন্দোবস্তের আওতায় আনতে চাইলেন।

রামমোহন-দ্বারিকানাথ বললেন, সাহেবদের নীলচাষের ফলে দেশের ও দশের উপকার হচ্ছিল। রামমোহনের জীবনী-লেখকদের মধ্যে অনেকেই এই মত সমর্থন করেছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, যুগপৎ নীলের চাষ শুরু হতেই দেশের মধ্যে দুরকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল—ভালো নীলকরের আশেপাশের লোকদের আর্থিক সাচ্ছল্য স্পষ্টতর হয়ে উঠল ; কিন্তু অত্যাচারী দুর্বৃত্ত জমিদারদের ন্যায় নীলকরের অভাব ছিল না, সেখানে শোষণ পেষণ পুরোদস্তর চলত। আমরা নীলচাষের এই নড়াত্মক দিকটার সঙ্গে সুপরিচিত। কিন্তু industrialization-এর অপর দিকটার প্রতি মনোযোগ দিইনি ; "নীলদর্পণে" একপেশে কড়া বাস্তব রূপটা পড়ে। (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য', পৃঃ ২৫) তথাকথিত "ভালো নীলকর"-এর বিষয়টি স্পষ্ট নয়। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে নীলের দাদন সম্পর্কে বুকানান, হামিল্টন কৃষকদের ভীতি লক্ষ করেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ্ হেবারকে নদীয়ার এক ব্রাহ্মণ যুবক বলেছিলেন, "The indigo is a fine thing to put money into the purse of the Baboo, but we poor people do not want to see it. It raises the price of rice, and the rent of land." (Heber, *Narrative of a Journey, etc.*, Vol. I, P. 113) সে-কালে John Crawford নামক লেখক ভারতে অবাধ বাণিজ্য-নীতির একজন সমর্থক ছিলেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি *A Sketch of the Commercial Resources and Monetary and Mercantile System of India* নীর্ষক একটি পুস্তিকা লেখেন ; তাতে এক জায়গায় লিখেছেন, আরো অনেক কারণ সহ নীলের অবাধ কাটকা-

বাজির অনিবার্য পরিণতি ছিল কলকাতা ও বোম্বাইর এজেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর পতন। হয়তো ঐ ফাটকাবাজির ফলেই কার-টেগোর কোম্পানির পতন হয়। রামমোহন-দ্বারিকানাথের সময়ে 'ভালো' নীলকররাও নীলের চাষ জনপ্রিয় করতে পারেনি। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ-অধিকৃত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ক্রীতদাসপ্রথা বেআইনি হয়; সেখান থেকে কতগুলো সাহেব এখানে এসে নীলকর হয়, কারণ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের Charter Act তাদের এখানে এসে জমিদারি করার অধিকার দিয়েছিল। এদের কীর্তি-কলাপ আমাদের অজ্ঞাত নয় (Buchanan, *Development of Capitalist Enterprise in India*, Pp. 36-37) নীলচাষের নঙর্থক দিক তখন স্পষ্টতর হলো; সমকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার সমালোচনাও হতে থাকল। এজন্য দীনবন্ধু মিত্রকে দোষ দেওয়া যায় না।

রামমোহন-দ্বারিকানাথ এবং তাঁদের বন্ধুরা সাহেবদের ভারতবর্ষে ডেকে এনে জমিদার বানাবার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। রামমোহন *Remarks on the Settlement of India by Europeans* [*English Works*, Pp. 113-20] ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে House of Commons নিযুক্ত একটি Select Committee-তে পেশ করেন। সাহেবদের ভারতবর্ষে এসে বসবাস করার নয়টি গুণ তিনি গণনা করেন, যথা :

(ক) উন্নত কৃষিব্যবস্থা, (খ) ভারতীয়দের কুসংস্কারসমূহের দূরীকরণ, (গ) উন্নত, প্রগতিশীল বিচার- ও শাসন-ব্যবস্থা, (ঘ) শিক্ষা ও শিল্পের উন্নতি, (ঙ) ভারতের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগের সম্প্রসারণ, (চ) ভারতীয় কৃষকদের জমিদার রূপ বাহুমুক্তি, (ছ) বহিরাক্রমণ থেকে ভারতের নিরাপত্তা বৃদ্ধি, (জ) ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্ক, (ঝ) ভারতবাসীর খ্রীষ্টান ধর্ম, ইংরাজি ভাষা, এবং সাহেবী আচার-ব্যবহার গ্রহণ এবং অনুসরণ, এবং তার ফলে ব্রিটেন থেকে ভারত কোন অভাবনীয় কারণে আলাদা হয়ে গেলেও উভয় দেশের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক বজায় থাকার সম্ভাবনা, এবং ধীরে ধীরে বৃটেন ও ইউরোপের সাহায্যে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার।

Assimilation নামক সামাজিক প্রক্রিয়া আধুনিক সমাজতত্ত্বের একটি মৌল ধারণা। কথাটির সংজ্ঞার্থ নির্দিষ্ট হয়েছে এ-ভাবে : 'Assimilation is a process of interpenetration and fusion in which persons and groups acquire the memories, sentiments and attitudes of other persons and groups, and by sharing their experience and history, are incorporated with them in a cultural life.' [R. E. Park & E. W. Burgess, *Introduction of the Science of Sociology*, 1924, p. 735] রামমোহন সাহেবদের সঙ্গে ভারতবাসীর এই assimilation চেয়েছিলেন; শব্দটির ব্যবহার ক'রে তিনি লিখেছিলেন : 'Such assimilation has in some measure taken place at Calcutta, from the daily communication of many of the respectable members of both communities.' [*English Works*, P. 74] Assimilation-এর ব্যাখ্যা করে Ogburn এবং

Nimkoff লিখেছেন : 'One process of assimilation is the suppression of parent culture. The other is the acquisition of new ways, including the new language.' [*Handbook of Sociology*, 1966, 105-106] রাজা রামমোহন যে 'suppression of the parent culture' প্রস্তাব করেছিলেন, নিদেনপক্ষে তার চারটি প্রমাণ দাখিল করা যায়।

(ক) তিনি ইউরোপিয়ান ও ভারতীয়দের 'assimilation'-এর জন্য 'a strong and vigorous police in every village' প্রস্তাব করেছিলেন। [*English Works*, P. 74) বিদেশী সরকার দেশওয়ালিদের এ দেশে ডেকে এনে শক্তিশালী পুলিসের সাহায্যে তাদের ভারতীয় বানিয়ে ফেলবে, রামমোহন নিশ্চয় এ রকম ধারণা করার মতো মূর্খ ছিলেন না। বরঞ্চ তার বিপরীত চিন্তাই স্বাভাবিক ছিল।

(খ) তিনি প্রথম কিস্তিতে, বিশ বছর ধরে, শুধু 'higher and better educated class of Europeans-দের এদেশে আমদানি করার প্রস্তাব করেন। [*English Works*, P 116] এখানে তাঁর স্ববিরোধ সুস্পষ্ট, কারণ তিনি মনে করেছিলেন, এ ধরনের সাহেবরা সহজেই ভারতীয়দের আত্মীয় হতে পারবে। Assimilation-কে তিনি এই প্রস্তাবে উভয় দেশের শিক্ষিত, ধনী, এবং সভ্যলোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ ভবিষ্যতের শাসকশ্রেণীরূপে একটি সঙ্করশ্রেণীর উদ্ভব ইচ্ছা করেছিলেন।

(গ) তিনি প্রেসিডেন্সি আদালৎ-সমূহে 'European pleader'-দের নিয়োগ করার প্রস্তাব করেন। [*Ibid*. P. 117]

(ঘ) পূর্বোক্ত 'খ'-চিহ্নিত প্রস্তাবটি তিনি কমন্স সভার কাছে চৌপের মত ক'রে ফেললেন এবং বললেন, 'yet, as before observed, if events should occur to effect a separation (which may arise from many accidental causes, about which it is vain to speculate or make predictions) still a friendly and highly advantageous commercial intercourse may be kept up between two free and Christian countries, united as they will then be by resemblance of language, religion and manners.' [*Ibid*, P. 119, P. 115-116]

এ-সব তথ্য থেকে যদি মনে করা যায় যে, ইউরোপিয়ানদের এদেশে এনে রাজা রামমোহন রায় 'suppression of parent culture' চেয়েছিলেন, অর্থাৎ ভারতীয় ধর্ম, ভাষা ও লোকব্যবহারকে 'Europeanize' করে ভারতীয় সভ্যতার মৌল এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন চেয়েছিলেন, তবে কি ভুল হবে? যদি তা ভুল না হয়, তবে রাজা রামমোহন রায়কে আধুনিক ভারতের স্রষ্টা তো কোনরকমেই বলা যাবে না। [B. B. Majumdar, *History of Political Thought from Rammohan to Dayananda*, P. 46]

কিন্তু এই বাহ্য। রামমোহন-দ্বারিকানাথ ভেবেছিলেন, বর্ণবিদ্বেষ শুধু নিচুস্তরের অশিক্ষিত সাহেবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বারিকানাথ কোনকালে সাহেবদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন

কিনা, জানি না ; কিন্তু রামমোহন বেশ উঁচু স্তরের এবং উচ্চপদস্থ সাহেবের হাতে লাঞ্ছিত হন, এবং খোদ গভর্নর-জেনারেলের কাছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ["সাহিত্য-সাধক চরিতমালা"-১৬, পৃ. ২৫-২৯] কর্নওয়ালিস্-প্রবর্তিত Native Exclusion Act-এর মাহাত্ম্যে কোম্পানির চাকরি ক'রে রামমোহন সেরিস্তাদার পর্যন্ত হতে পেরেছিলেন ; আরো ওপরে উঠবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ভারতের গভর্নর-জেনারেল Marquess of Hastings হিন্দুদের সম্পর্কে লিখেছিলেন : 'The Hindoo appears a being merely limited to mere animal functions, and even in them indifferent." [R. C. Majumdar, ed. *The British Paramountcy and Indian Renaissance*, Vol II, Pp. 337-38]

দ্বিতীয়ত, একটি বিশেষ শ্রেণী হিসাবে জমিদারের মধ্যে খারাপ-ভালোর কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না। অথচ তাঁদের মতে নীলকররা অন্যান্য জমিদারদের চেয়ে প্রজাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে ভালো ছিল। এই মত নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। তাছাড়া পরবর্তী ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, নীলকররা (দু-একটি ব্যতিক্রম সত্ত্বেও) ছিল প্রজার যম, এবং বর্বর।

তৃতীয়ত, রামমোহন-দ্বারিকানাথ ভেবেছিলেন—বিলিতি উদ্বৃত্ত মূলধন এদেশে নিয়োগ করা হলে এখানকার শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হবে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে বিলিতি মূলধনের কিছু কিছু অংশ এদেশে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তাতে ফল কী হয়? ঐতিহাসিক লিখেছেন, ১৮৩৩-এর পরেও 'the continuance of Indian national inferiority remained a cardinal maxim of British policy.' [*History of Bengal*, (C.U), P. 137] ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মনট্গোমারি মার্টিন লক্ষ করলেন, ভারতের শিল্পোন্নয়ন দূরের কথা, বৃটিশ বণিকদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে ব্রিটেনের একটি 'agricultural farm' বানিয়ে রাখা। ভারতের কাঁচামাল বিলেতের শিল্পবিপ্লব সার্থক ক'রে তুলল। ভারতের গরিবদের ওয়েস্ট ইণ্ডিজে চালান করা হতে লাগল। ১৮২৫ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দুর্ভিক্ষে মারা গেল ৪০০,০০০ ভারতবাসী ; অথচ ভারতের শস্য সাহেবদের পেট ভরাতে লাগল। [R. P. Dutt, *India To-day* (1970) Part II, Ch. V]

এসব তথ্য থেকে যদি সিদ্ধান্ত করি যে দ্বারিকানাথ-রামমোহনের এই আন্দোলন ছিল সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক এবং জাতীয়তাবাদবিরোধী আন্দোলন, তবে নিশ্চয় ভুল হবে না।

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন-দ্বারিকানাথের উপনিবেশবাদী আন্দোলন যে প্রগতিশীল ছিল, তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন ; তিনি লিখেছেন, 'ইংরেজরা দলে দলে এসে পঙ্গপালের মত এদেশের মাঠ উজাড় করে খেয়ে যাক এ সর্বনাশী কল্পনা রামমোহনের মাথায় কখনো আসেনি, আসা সম্ভব ছিল না। ভারতবর্ষের অবনতি দেখে তিনি দুঃখে ও ব্যথায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিলেন···' ইত্যাদি। [সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন"] পৃ. ১১৩, রামমোহন-দ্বারিকানাথ তবে পরিণতি চিন্তা না করেই, কিংবা না জেনেই উপনিবেশবাদী আন্দোলন করেছিলেন! এছাড়া আর কী বলা যায়?

ইতিমধ্যে বাঙলার সমাজ-জীবনের উচ্চ ও মধ্যস্তরে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল। অনেক উল্লেখযোগ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন ঘটে গেছে যার সুবিস্তৃত ইতিহাস বর্তমানে

আমাদের জানা। শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন, ধর্মসংস্কারের আন্দোলন, সমাজসংস্কারের আন্দোলন —এ-সব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তথাকথিত বাঙালী রেনেসাঁস-এর ভাবমূর্তি প্রকাশিত হয়। এ-সব আন্দোলনের প্রগতিশীলতা এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। রামমোহন-দ্বারিকানাথ এ-সব আন্দোলনের নেতা ছিলেন ; যাঁরা ধর্মের সংস্কার চাননি, সতীদাহপ্রথাকে চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ, যেমন রাধাকান্ত দেব, স্ত্রীশিক্ষার জন্য সচেষ্ট হন ; এমনকি বিধবাদের চিতায় তুলে মারবার কুসংস্কারের ঘোরতর সমর্থক হলেও রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। দেখা যায়, রেনেসাঁসের আদিপর্বে প্রগতিশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবধান ছিল না ; রামমোহন বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু বৈধ মদ্যপান তাঁর মতে ভদ্র ব্যবহার বলা যেতে পারত। তিনি লিখেছিলেন : 'বিধবার বিবাহ তাবৎ সম্প্রদায়ে অব্যবহার্য হইয়াছে সুতরাং সদ্ব্যবহার কহাইতে পারে না কিন্তু বিহিত মদ্যপান ও বৈধ হিংসা সল্লোকেদের মধ্যে অনেকের ব্যবহার্য অতএব তত্তৎ পক্ষে সে সর্বথা সদাচার ও সদ্ব্যবহারে গণিত হইয়াছে।" [দ্র: 'রামমোহন গ্রন্থাবলী" সাহিত্য পরিষৎ, (৬) 'পথ্যপ্রদান'] এই একটি উদ্ধৃতি থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, রামমোহনের মতে সামাজিক আচার ভাল কি মন্দ তার বিচারের একমাত্র উপায় লোকমত। এ-সব কূটতর্কের মধ্যে না-গিয়ে বলা যায়, এ-সব সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের ফলে বাঙলার কৃষকদের কোন উপকার হয়নি, এবং তাদের উপকার সাধনের জন্যও এ-সব আন্দোলন হয়নি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করি।

(ক) ব্রাহ্মধর্মের কথা ধরা যাক। ব্রাহ্মধর্মান্দোলনে কৃষকের কিছু উপকার হয়নি। প্রথমত, এই আন্দোলনে তার কুসংস্কার দূরীভূত হয়নি। দ্বিতীয়ত, এতে তার ক্ষুধা মেটেনি, তার দারিদ্র্য দূর হয়নি। ব্রাহ্ম ঐতিহাসিকরাও ঠিক জানেন না, কবে মিশনারিদের অনুকরণে, গ্রামাঞ্চলে ব্রাহ্মধর্মের প্রসার হয়েছিল। যোগানন্দ দাস লিখেছেন : 'রামমোহনের ধারা তাঁহার জীবিতকালের মধ্যেই নগর ছাড়িয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের সময়ে গ্রামে প্রচারকার্য আরম্ভ হইয়াছে। পরে শুধু জমিদারীর পেয়াদা বরকন্দাজের মধ্যেই নয়, এই আন্দোলন গ্রামে আরো অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল।' ["রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন," পৃ. ৪৫] প্রথমত, যোগানন্দবাবু গ্রামে ব্রাহ্ম আন্দোলন শুরু হওয়ার তারিখ সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য মত প্রকাশ করেননি। দ্বিতীয়ত, তিনি প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন যে, প্রথম দিকে 'জমিদারীর পেয়াদা বরকন্দাজের মধ্যেই' ব্রাহ্ম প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ, রামমোহনের মতাবলম্বী কোন 'প্রভু' অথবা 'শ্রীযুত' ব্রাহ্ম হলেন ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভৃত্যরাও ব্রাহ্ম হলেন। কিন্তু প্রশ্ন, ব্রাহ্ম জমিদার কি চাষীর খাজনা শুধু আইন-অনুসারে আদায় করতেন, নাকি তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন শরৎচন্দ্র-বর্ণিত 'রাসবিহারী'? ["দত্তা" উপন্যাস দ্রষ্টব্য] ব্রাহ্ম 'পেয়াদা বরকন্দাজের' দল কি সত্যি সত্যি সচ্চরিত্র এবং ভদ্রলোক ব'নে গেল? জেলা গেজেটিয়ার অনুসারে যোগানন্দবাবু পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রসারের যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, কিছু জমিদার ও মধ্যস্বত্বোপভোগী জোতদার-জাতীয় লোক এই ধর্মের সমর্থক হয়, এবং কোথাও কোথাও দু-একটা বিদ্যালয় খুলে সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ভাণ করে মাত্র। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলা উচিত, গ্রামে ব্রাহ্মধর্মের প্রসার হওয়া

সম্ভবই ছিল না; তেত্রিশ কোটি গ্রাম্য দেবদেবীর 'ব্রাহ্মনিঃশ্বাস'-এ লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

(খ) এবার কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলনের ফল কী দাঁড়িয়েছিল, দেখা যাক। রামমোহন সহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধাভোগী বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ব্রিটিশ শাসনের গুণগানে পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কি জানতেন না, তাঁদের সময় পর্যন্ত কোটি কোটি টাকা এ-দেশ থেকে লুটে নিয়ে, ১৮১৩ সালে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়ার মত মাত্র ১ লক্ষ টাকা কোম্পানি শিক্ষাবিস্তারের জন্য অনুমোদন করেছিলেন? সে-টাকাও কিভাবে খরচ হবে, তা ভেবে ঠিক করতেই শাসকদের দশ বছর সময় লাগল। শিক্ষার জন্য টাকা খরচ সম্পর্কে কোম্পানির নীতি বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক ফিলিপ্‌স্ লিখেছেন: 'No educational policy worth the name could be developed unless adequate funds were available . . . the home government enjoined the Bengal Government primarily to concern itself with quality rather than the quantity of education . . . It should be borne in mind [they said] that were the country to be studded with schools, they would be wholly unprofitable both to the Government and the people, unless the branches of knowledge taught in them were fully useful and their tendency to degenerate were dosely watched and provided against." [C. H. Philips, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, P. 247] জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সরকার বাহাদুর একেবারেই পছন্দ করেনি। ব্রিটেন থেকে কর্মচারি এনে শাসন চালানোর খরচ বেড়ে যাচ্ছিল; তাই *Cambridge History of India*-র (Vol. VI, P. 109) মতে এদেশের লোকদের ইংরাজি শিখিয়ে কাজে লাগানর কথা কোম্পানির কর্তারা ১৮২২ থেকে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ ঘোষণা করেছিলেন: 'The first object of improved education should be to prepare a body of individuals for discharging public duties.' [C. H. Philips, P. 248]। এই হলো কেরানি তৈরির কারখানাগুলোর সূত্রপাত।

রাধাকান্ত দেব, রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার এবং মিশনারিরা, শিক্ষাসঙ্কোচনের এই সঙ্কীর্ণ ও অনুদার নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি। রামমোহন রায় বিলাতি ভাষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির এত ভক্ত ছিলেন যে তিনি নিজের থেকে এ-সবের গুণগান গেয়ে, এবং সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন ভারতের দর্শনসমূহের নিন্দা ক'রে লর্ড আমহার্স্টকে একটি পত্র লেখেন। (১১ই ডিসেম্বর, ১৮২৩) সরকার বাহাদুরকে শিক্ষাবিস্তারের জন্য আরো টাকা খরচ করার অনুরোধ করলেন না; তা তিনি দাবিও করলেন না। তিনি বললেন, যে-টাকা শিক্ষার জন্য খরচ করার কথা, তা কেবল ইংরাজি শিক্ষা প্রসারের জন্য খরচ করা হোক্ এ-চিঠির উত্তরে লর্ড আমহার্স্টের তরফ থেকে রামমোহনের জ্ঞান-দান সম্পর্কে মন্তব্য করা হ'লো: '(The letter) is obviously written under an imperfect and erroneous conception of the plan of education and course of study...

that the defects and demerits of Sanskrit literature, and philosophy, are therein represented in an exaggerated light, and that the arguments in favour of encouraging native learning, as well as the positive obligation to promote its revival and improvement, imposed on the Government by the terms of the Act of Parliament . . . have been wholly overlooked by the writer.' General Committee of Public Instruction-এর সভাপতি জে. এইচ. হারিংটন ঐ চিঠি সম্পর্কে মন্তব্য করলেন: 'The application to Government against the cultivation of Hindu literature, and in favour of the substitution of European tuition, is made professedly on the part, and in the name of the natives of India. But it bears the signature of one individual alone, whose opinions are well-known to be hostile to those entertained by almost all his countrymen.' [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' (১), পৃ. ৬৭-৭১] মঞ্জুরির সমস্ত টাকাই একটি কলেজ খুলে, সাহেব মাস্টারদের দিয়ে, 'Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, and Anatomy' ইত্যাদি শেখাবার প্রস্তাব করলেন রাজা রামমোহন রায়। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রচারের জন্য রামমোহন কী করেছিলেন? এ-প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, কলকাতার কিছু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোকদের নিয়ে তিনি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে Commercial and Patriotic Association নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এ-সভার কর্মকর্তাদের মধ্যে বাঙালী হিসেবে একমাত্র রামমোহনই ছিলেন; অন্যান্য সভ্যরা ছিলেন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, এবং তৎকালীন শেয়ার-বাজারের ব্যবসায়ী। যোগানন্দ দাসের মতে রামমোহন '১৮২৮ সালের বহু পূর্ব হইতেই স্টক এক্সচেঞ্জের সহিত যুক্ত ছিলেন।' [পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১২০; পাদটীকা] সে যাই হোক, Commercial and Patriotic Association-এর একটি উদ্দেশ্য ছিল 'to promote the work of sound and wholesome education among the native population...' কিন্তু এই উদ্দেশ্য আদৌ সফল হয়েছিল কিনা, তা জানা যায় না। লক্ষণীয় বিদ্যাসাগরও পরে বেদান্ত দর্শনকে 'false system' হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন; কিন্তু তিনি একা, নিজের চেষ্টায়, গ্রামে গ্রামে যে-ভাবে স্কুল-পাঠশালা খুলেছিলেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য এবং জনশিক্ষার প্রসারের জন্য অক্লান্তভাবে যে-পরিশ্রম করেছিলেন, অন্যান্য বড়মানুষ বাঙালীদের মধ্যে তার নজির খোঁজ করা পণ্ডশ্রম। রামমোহন, রাধাকান্ত, দ্বারিকানাথ, নবাবঙ্গ—এঁরা কৃষকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য কী করেছিলেন? এঁদের শিক্ষামূলক চিন্তাধারায় কৃষকদেরও স্থান ছিল, প্রমাণের অভাবে এমন কথা বলা যায় না। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' বাঁশবেড়িয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পাঠশালা স্থাপন উপলক্ষে অক্ষয়কুমার দত্ত যে বক্তৃতা করেছিলেন, তাতে তিনি শুধু শহর অঞ্চলেই শিক্ষাপ্রসারের সীমাবদ্ধতার নিন্দা করেন, বঙ্গভাষার বিস্তার ও 'স্বজাতীয় ধর্ম' রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন, এবং বলেন, 'কিয়ৎকাল গৌণে ইংরেজদিগের সহিত আমার দিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবেক না।'

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, এঁরা স্পষ্টতই পূর্বোক্ত উপনিবেশবাদী আন্দোলনের রামমোহনের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা অস্বীকার করেছিলেন, এবং রামমোহনের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাধারার দুর্বলতা উপলব্ধি করেছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত এই বক্তৃতায় বলেছিলেন, বাঙলা ভাষায় ‘বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রে উপদেশ প্রদান’ করার জন্যই ‘তত্ত্ববোধিনী’ পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (যোগানন্দ দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৮-৪১)

প্রায় সমগ্র উনিশ শতক ধরেই বিদেশী সরকার এবং স্বদেশী জমিদারশ্রেণী কৃষকদের অজ্ঞানতার অন্ধকূপে চেপে রেখেছিল। নিজেদের বিলাস, আড়ম্বর, খানাপিনার জন্য কোটি কোটি টাকা বাঙলার জমিদাররা ব্যয় করে। মতিলাল শীল, রাধাকান্ত দেব, দ্বারিকানাথ ঠাকুর,—এঁদের এবং আরো কিছু বড় বড় জমিদারের দানধ্যানের বিবরণ অজ্ঞাত নয়। দ্বারিকানাথ ‘ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটি’-তে এক লাখ টাকা দান করেন; তা সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রশংসিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: ‘দ্বারিকানাথ ঠাকুরের তৎকালীন বিপুল ঐশ্বর্যের আমরা যথাযথ ধারণাই করতে পারি না; পিতৃদেবের মুখে শুনেছি যে, পিতামহ যখন বিলাতে অবস্থান করতেন তখন মাসিক তাঁকে লক্ষাধিক টাকা পাঠানো হত।’ ‘মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ’, পৃ. ৫৮-৫৯.] দ্বারিকানাথ ছাড়াও আরো অনেক ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি তখন ছিলেন। তাঁদের ধারণাতীত ঐশ্বর্যের তিলপরিমাণও লোকশিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়নি; হয়তো, তবে তার প্রচারে আকাশ কেঁপে উঠত। এ বিষয়ে সমকালীন একজন মাত্র জমিদারের ‘বিদ্যোৎসাহিতা’র অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়, তিনি হলেন উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। [অম্বিকাচরণ গুপ্ত, “জয়কৃষ্ণ-চরিত,” একাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।] তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর জমিদারির মধ্যে স্কুল-পাঠশালা নিজের খরচেই চালিয়েছিলেন। কিন্তু দেশের মানুষের দুঃখে যাদের হৃদয় জ’লে-পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছিল ব’লে মনে করা হয়ে থাকে, যে নব্যবঙ্গের গুণগান এখনও গীত হয়ে থাকে,—তাঁরা গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কিছু করার মত মানসিকতাও তাদের ছিল না। ‘সতীদাহ’-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন, ব্রাহ্মধর্মান্দোলন, এসব আন্দোলন সমকালীন অবস্থার বিচারে প্রগতিশীল ছিল না—একথা কেউ বলবে না। কিন্তু এ-সব আন্দোলনের পেছনে যে-উদ্দেশ্য ও মনোবৃত্তি সক্রিয় ছিল, তা আসলে ছিল নিতান্তই নাগরিক; এ-সব আন্দোলনের অব্যক্ত উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবিত্ত এবং জমিদার-তালুকদারদের মানসিক উন্নতি-বিধান। দেশের অগণিত গরিব এ-সব আন্দোলন সম্পর্কে কোন উৎসাহ বোধ করেনি, দেখায় নি।

অনেক বিষয়ে তথাকথিত ‘নব্যবঙ্গ’ বা Young Bengal-এর সঙ্গে রামমোহনের মিল ছিল না। প্রতিমা ভাঙবার জন্য নব্যবঙ্গ দলের কোন কোন যুবকের লাঠি হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, অর্থাৎ iconoclasm, দিনদুপুরে গোলদীঘির ধারে বসে মদ্যপান ও গোমাংস ভক্ষণ, পৈতা ছিড়ে ফেলা,—এ-সব সত্যি সত্যি দেশব্যাপী অত্যাচার, প্রবঞ্চনা, অশিক্ষা, পরাধীনতার বিরুদ্ধে গভীর জীবনদর্শন ও উপলব্ধি থেকে স্বতঃ উৎসারিত প্রতিবাদ ছিল না, ছিল বালসুলভ চপলতা মাত্র। ‘বিদ্রোহী’ ডিরোজিওর শিষ্যরা নিজেদের পত্রপত্রিকায় মাঝে মাঝে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে দু-চার কথা

লিখেছেন; তা ছাড়া, তাঁরা কৃষকদের অবস্থা ভালো করার জন্য কোন রকমের সক্রিয় অথবা তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন সৃষ্টি করেননি।

নব্যবঙ্গের মুখপত্র ছিল চারটি, যথা “পার্থেনন” (১৮৩০), “জ্ঞানান্বেষণ” (১৮৩১), “হিন্দু পাইওনীয়ার” (১৮৩৫) এবং বেঙ্গল-স্পেক্টেটর” (১৮৪২)। নব্যবঙ্গ অবাধ বাণিজ্যনীতির পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু ‘কলোনাইজেসন’ আন্দোলন এবং চিরস্থায়ী বন্দোব সম্পর্কে নববঙ্গের সকলেই একমত ছিলেন না। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি ‘The Colonization of India’ নামে বেনামিতে একটি প্রবন্ধ *India Gazette*-এ ছাপা হয়। বিমানবিহারী মজুমদারের মতে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন নব্যবঙ্গের কোন লেখক। (B. B. Majumdar, *History of Political Thought etc.* P. 24) এই প্রবন্ধে সবরকমের উপনিবেশিকতার নগ্নরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছিল।

নব্যবঙ্গের অন্যতম নেতা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যৌক্তিকতা স্বীকার করেননি। তিনি তার তীব্র নিন্দা করেন। [Abhay Charan Das, *The Indian Ryot*, Calcutta, 1881 দ্রষ্টব্য] “জ্ঞানান্বেষণ” পত্রিকায় নীলকরদের নিন্দা করা হয়। [*India Gazette*, May 22, 1833 দ্রষ্টব্য] কিন্তু ‘জ্ঞানান্বেষণ’-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোন বিকল্প সম্পর্কে আলোচনা হয়নি। কৃষকদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য রামমোহনের প্রায় সব প্রস্তাব এই পত্রিকা আত্মসাৎ করে। [*India Gazette*, May 10, 1833]

কলকাতার বাসিন্দা নব্যবঙ্গ এক সময়ে উপলব্ধি করে যে কৃষকদের অবস্থা না-জেনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করলে তা জোরদার হবে না। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এ-ব্যাপারে “বেঙ্গল স্পেকটেটর” এগিয়ে আসে, এবং সে-বছরের ২৪শে জুলাই রায়তদের অবস্থা সম্পর্কে ৩০টি প্রশ্ন প্রকাশ করে। পাঠকদের কাছ থেকে এ-সব প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয়। অনেক পরে পাদরি লং সাহেব এ-ধরনের *Five Hundred Questions* ছাপিয়ে প্রচার করেন। “বেঙ্গল স্পেকটেটর’-এ হুগলীর ‘মিয়াজান’ নামক গরিব চাষীর ওপরে জমিদারের অত্যাচার বর্ণিত হয়। এই বিবরণে তৎকালীন পুলিশ, উকিল, এবং রাজস্ব-সংক্রান্ত বিচার বিভাগের জমিদার-তালুকদার-প্রীতি উদ্ঘাটিত হয়েছে। এখানেও রামমোহনের প্রভাব লক্ষণীয়। মিয়াজানের বিবরণ প’ড়ে মনে হয়, পুলিশ, উকিল ও বিচারক যদি তার প্রতি একটু সহানুভূতি দেখাতো, তবে তার তেমন কষ্ট হতো না। রামমোহন এ-কথাই বলেছিলেন। [বিনয় ঘোষ, “সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র,” (৩), পৃ, ১১২-১৭, ১২৪-২৮, ২৬৯-৭১]

কৃষকদের স্বার্থে নব্যবঙ্গ চেষ্টা করলে একটি জোরালো আন্দোলন শুরু করতে পারত। তা করা হয়নি। নব্যবঙ্গের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাহেবদের মত ইংরাজি বলার ক্ষমতা অর্জন করা, iconoclastic আন্দোলন জোরদার করে তোলা, এবং তৎকালে প্রচলিত ব্রিটেনের বুর্জোয়া উদারনীতির এবং অবাধ বাণিজ্যনীতির জয়ঢাক পেটানো। যে-দক্ষিণারঞ্জন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিন্দা করলেন, পরে তিনিই অযোধ্যা অঞ্চলে তালুকদারি ফেঁদে বসেন, সিপাহী-বিদ্রোহের সময় উত্তর প্রদেশের রাজভক্ত তালুকদারদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করেন। রামগোপাল ঘোষ ব্যবসায়ে চলে আসেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক “ডেপুটি” হন। এঁরা, অর্থাৎ নব্যবঙ্গ, কালক্রমে অবহেলিত, পদদলিত মিয়াজানদের কথা ভুলে যান।

রামমোহন-দ্বারিকানাথ পরিচালিত উপনিবেশবাদী আন্দোলনের সময় বাঙালী জমিদাররা দুই দলে ভাগ হয়ে যান; এই অনৈক্যের একটি কারণ ছিল 'ব্রাহ্ম' এবং 'হিন্দু' জমিদারদের ধর্মীয় দলাদলি। নীলকরদের সমর্থনে যেই রামমোহন-দ্বারিকানাথ কথা বললেন, অমনি 'স্বদেশী' জমিদারদের দেশপ্রীতি যেন উথলে উঠল। তাঁরা "সমাচারচন্দ্রিকা" এবং *John Bull* জাতীয় প্রতিক্রিয়াশীল পত্র-পত্রিকায় নীল চাষীদের কষ্ট, বিদেশী দ্রব্যের আমদানিতে এদেশের কুটীরশিল্পগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়া—এ-সব বিষয় নিয়ে লেখা শুরু করলেন। যেই দেখলেন, কায়েমি স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে, অমনি দেশের জন্য এবং কৃষকদের জন্য তাঁদের দরদ উথলে উঠল। কমন্স সভার কাছে একটি আবেদনে তাঁরা নীলচাষের কুফল বর্ণনা করলেন। [J. K. Majumdar, *op. cit*, Pp. 432-33] অনেক নীলকর সাহেব অত্যাচারী ছিল; কিন্তু 'স্বদেশী' জমিদাররা কি সাধু ছিলেন? তাঁরা কৃষকদের মঙ্গলের জন্য কী করেছিলেন? পূর্বে উল্লিখিত ক্রফর্ড সাহেব লিখেছিলেন, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে একজন বাঙালী চাষীর বার্ষিক আয় ছিল ৩০ থেকে ৪০ শিলিং। মাথা-পিছু করের বোঝা ছিল ৪ শিলিং ৬ পেনস্। মহাজনের কাছে টাকা ধার না-করে কোন কৃষকের পক্ষেই কিছু করা সম্ভব ছিল না। করভারে প্রপীড়িত, দীন-দরিদ্র, নিরন্ন বাঙলার কৃষক ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দেও ক্রফর্ডের মনোজ্ঞ ভাষায়, খেয়ে থাকত 'vilest food,···wild roots, herbs, insects.'

তবে কিন্তু জমিদারদের মধ্যে এই ঝগড়াঝাটি বেশিদিন চলেনি। সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা আদায় করার জন্য এঁরা বিভেদ ভুলে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করলেন Zamindary Association of Calcutta। রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন,—এঁরা হাত মেলালেন। যাতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই বিনা বাধায় বার্ষিক ২২ টাকা চাঁদা দিয়ে এই সংস্থার সভ্য হতে পারে, সেভাবে এই সংগঠনের সংবিধান রচিত হল। শুধু 'possession of interest in the soil of the country' হলো সভ্য হওয়ার শর্ত। প্রজাদেরও এ-সংগঠনের সভ্য হওয়ার ব্যাপারে নিষেধ ছিল না। কাগজেকলমে রইল গণতান্ত্রিক কাঠামো; কিন্তু কার্যত এই সংগঠন হল শুধু জমিদারদের সংগঠন।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানত দ্বারিকানাথ ঠাকুরের উৎসাহে, এই সংগঠনটির নাম করা হলো Landholders' Society। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে নভেম্বর কলকাতার টাউন হলে Landholders Society-র একটি সভা হয়; দ্বারিকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাব অনুসারে তার সভাপতি হন রাধাকান্ত দেব। এটি ছিল উদ্বোধনী সভা। অনেক সাহেব এতে যোগদান করেন। এই সভার পূর্ব বিবরণ কিশোরীচাঁদ মিত্র রচিত *Memoir of Dwarkanath Tagore* (1870) গ্রন্থের পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায়, কোম্পানির শাসনের প্রশংসা, জমিদারদের স্বার্থরক্ষার উপায় বার করা, এবং পুলিশ ও রাজস্ব বিষয়ক সংস্কারের দাবি—এই তিনটি ছাড়া, কৃষকদের সম্পর্কে, অর্থাৎ কৃষকদের ওপরে জমিদারি নিপীড়নের হ্রাসকল্পে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এক সাহেব বক্তা এ-সভায় বলেছিলেন: 'আমার বিশ্বাস, কোম্পানি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে (Hear! Hear!) আমার বিশ্বাস, কোম্পানি যথাশক্তি মঙ্গলময় কাজে লিপ্ত! কোম্পানি যে ভারতের কত উপকার করেছে তা বলা যায় না!—ইত্যাদি।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ভূম্যধিকারী সভা' অথবা Landholders' Society-র কৃতিত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছিলেন: 'It gave to the people the first lesson in the art of fighting constitutionally for their rights, and taught them manfully to assert their claims and give expression to their opinions. Ostensibly it advocated the rights of the Zamindars, but as their rights are intimately bound up with those of the Ryots, the one cannot be separated from the other.' [B. B. Majumdar, *Indian Political Associations*, P. 25] দুঃখ হয় এই দেখে যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অমন বিদ্বান ব্যক্তি কৃষকের স্বার্থ ও জমিদারদের স্বার্থের মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখলেন না! এই সংগঠনটির কার্যকলাপ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, প্রজাদের এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি কী করেছিল, তা বলা মুস্কিল, তবে এই প্রতিষ্ঠানে দেশী-বিদেশী জমিদারদের সমভূমিতে মেলামেশা হয়েছিল। [তদেব]

রবীন্দ্রনাথ পাবনা কনফারেন্সের নেতাদের কৃষকদের প্রতি অবহেলার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে লিখেছেন: 'তখনকার দিনে দেশের পলিটিক্স্ নিয়ে যাঁরা আসর জমিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না যাঁরা পল্লীবাসীকে এদেশের লোক বলে অনুভব করতেন।···আমাদের দেশাত্মবোধী দেশ বলে একটা তত্ত্বকে বিদেশের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন, দেশের মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন না।' ["রাশিয়ার চিঠি," পৃ. ২০-২১]

Landholder's Society এবং পরবর্তী Bengal British India Society-র কার্যকলাপ অভিনিবেশসহ বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের এই অত্যন্ত মূল্যবান বিশ্লেষণের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাবে। ১৮৩৯ সালে বিলেতে এদেশী জমিদারদের পক্ষে মাতব্বরি করার জন্য রামমোহনের বন্ধু অ্যাডাম সাহেব 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপন করেন। অ্যাডাম অবশ্য এদেশ সম্পর্কে অনেক খবর রাখতেন; শিক্ষা-বিষয়ক তাঁর *Report*-এর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিমেয়। এই সোসাইটি বিলেতে Landholders' Society-র পক্ষে আবেদন-নিবেদন চালাতে থাকে। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারিকানাথ বিলাত যান। সেখানে সোসাইটির নেতা বাগ্মী জর্জ টমসনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। ১৮৪২-এর শেষে দ্বারিকানাথ টমসনকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। শেষ পর্যন্ত এককালের ক্রীতদাস-মুক্তি আন্দোলনের নেতা জর্জ টমসন পাকাপাকিভাবে কলকাতার জমিদারদের লণ্ডনস্থ এজেন্ট নিযুক্ত হলেন। টমসন এখানে এসে জমিদারি স্বার্থ এবং ব্যবসায়ী-উচ্চমধ্যবিত্ত স্বার্থের মধ্যে সংযোগ সাধনের চেষ্টা করেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তিনি জমিদারি আন্দোলনের আওতায় ইয়ং বেঙ্গলের নেতাদের টেনে আনলেন। সেটা সম্ভব হলো দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সমর্থনে। 'নব্যদল' টমসন সাহেবকে সভাপতি ক'রে প্রতিষ্ঠা করল Bengal British India Society। এর সম্পাদক হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। এঁরা বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্ব চাইলেন, শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বনে 'জনগণের' যথার্থ অধিকার রক্ষা করতে চাইলেন, বিচারব্যবস্থা ও পুলিশ শাসনের সংস্কার দাবি করলেন। প্রচুর বঙ্গবাসী সাহেব এ-সভার সভ্য হলেন। জমিদারদের কথা না-হয় ধরলাম না। কিন্তু রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী,

চন্দ্রশেখর দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, যাঁরা 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' এবং "বেঙ্গল স্পেক্টেটর"-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরাও কৃষকদের সম্পর্কে এই সংগঠনের মাধ্যমে কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করার চেষ্টাই করেন নি। শুধু প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে *Calcutta Review* পত্রিকায় কৃষকদের দুরবস্থা সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন।

Landholders' Society-র জমিদার-সভ্যরা ভাবলেন, অল্প বয়সের সব বানিয়ান, ব্যবসায়ী, তালুকদার এবং 'ডেপুটি'র দল বুঝি Bengal British India Society বানিয়ে সাহেবদের কাছে 'দেশের প্রতিনিধি' রূপে হাজির হয়ে মাতব্বরি করার অধিকার বাগিয়ে নিল! তাঁরা ঐ-সোসাইটির সঙ্গে সহযোগিতা করলেন না! শেষ পর্যন্ত দু'টি সংগঠনই উঠে গেল আলস্য, অকর্মণ্যতা, এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে। পরে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরে নেতৃত্বে, ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হল দেশহিতৈষিণী সভা (National Association) এবং ভারতবর্ষীয় সভা (British Indian Association)। কৃষকদের জন্য এই দুই সভা সামান্যই কাজ করেছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন : 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নীলচাষ সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন।… কিন্তু এককভাবে নীলচাষীদের সমর্থন তাঁরা করেন নি। ভূস্বামী, প্রজা উভয় মিলেই এই সভা। শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ জড়িত বলে তাঁরা হয়ত তখন এ বিষয়ে আগ্রহ দেখান নি। পরে কিন্তু এই সাসিয়েশন জমিদারশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায়ই ষোলো আনা অবহিত হয়েছেন। ["মুক্তির সন্ধানে ভারত," পৃ. ৫৭]

আমাদের দেশের তৎকালীন জমিদারি সংগঠনগুলো এভাবেই গণতন্ত্রের এবং শান্তিপূর্ণ 'সংগ্রাম'-এর-বাঁধা বুলি আউড়ে দেশের কোটি কোটি মানুষকে ঠকিয়েছিল। বহু বছর ধরে একটানা এ ধরনের সাংঘাতিক প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত দুর্লভ। অথচ, তথাকথিত বাঙ্গালী রেনেসাঁসে এই সব সংস্থাগুলির স্থান অতি উঁচুতে।

উনিশ শতকের ত্রিশ দশক থেকে পত্র-পত্রিকায় বাঙালী কৃষকদের দুরবস্থা, এবং জমিদারি-তালুকদারি শোষণের তথ্যসমূহ আলোচিত এবং উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে। মার্শম্যান্-সম্পাদিত "সমাচার দর্পণ"-এ মাঝে মাঝে কৃষকদের খবর ছাপা হতো। নীলকরদের দৌরাত্ম্য, নীল-দাদনের ফলে কৃষকের দুর্দশা, বিলাতি সুতার আমদানিতে বিধবা "চরকাকাটনি"র সর্বনাশ, 'কলোনাইজেশন"-এর সম্ভাব্য পরিণতিস্বরূপ বাঙালী রাজমিস্ত্রী, 'ছুতার মিস্ত্রী', স্বর্ণকার, দরজি, নৌকা-ব্যবসায়ীদের বেকার হয়ে পড়া, 'তণ্ডুলের মূল্যবৃদ্ধিতে' বর্ধমানের এক কলুর বিশ বছরের যুবতী স্ত্রীকে বিক্রি করে দেওয়া—এ সব খবর মার্শম্যান্ অবজ্ঞা করেন নি। (দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা") ওদিকে নীলরত্ন হালদার সম্পাদিত "বঙ্গদূত" ব্রিটিশ শাসনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে 'গৌড় দেশের শ্রীবৃদ্ধি' নিয়ে গবেষণা করে। (১৩ই জুন, ১৮২৯)। বাঙালী জমিদারদের দুশ্চরিত্র্য, সর্বনাশা বিলাস-ব্যসন, স্বার্থপরতা, মূর্খতা প্রভৃতি দোষের বর্ণনা ও সমালোচনা ক'রে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন "কলিকাতা কমলালয়" (১৮২৩), "নববাবু বিলাস" (১৮২৫), "দূতী বিলাস" (১৮২৫) এবং "নববিবিবিলাস" (১৮৩০)। ভবানীচরণ পরে ধর্মসভার প্রধান কর্মকর্তা হন,

এবং ১৮২২ সালের ৫ই মার্চ থেকে তিনি "সমাচার চন্দ্রিকা" পত্রের সম্পাদনা করেন। রক্ষণশীল হলেও ভবানীচরণ জমিদারদের নৈতিক দুর্বলতার সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হন নি।

'বাবু' পরিচালিত কৃষকদের স্বার্থের জন্য 'সংগ্রাম' কালক্রমে কাগুজে লড়াইতে পরিণত হলো ; এই লড়াইতে সমকালীন বাঙলা পত্র-পত্রিকার কিছু ভূমিকা ছিল। বিশেষভাবে ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত "সংবাদ প্রভাকর" (প্রথম প্রকাশ, ১১ই জানুয়ারি, ১৮৩১) এবং পরে "তত্ত্ববোধিনী" (প্রথম প্রকাশ ১৬ই আগস্ট, ১৮৪৩), ইংরাজি সাময়িক পত্রিকা *Calcutta Review* (১৮৪৩) জমিদারি অত্যাচার, দুর্নীতি এবং কৃষকের দুর্দশার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে সক্রিয় ছিল। কৃষকদের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে এ-সব পত্রপত্রিকার অবদান, জমিদার ও নব্যবাবুদের কলকাতায় সমিতি বানিয়ে আবেদন-নিবেদন করার তুলনায়, অনেক বেশি ছিল। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তাঁর "সংবাদ ভাস্কর" পত্রিকায় মহাজনী কারবার-এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেন, এবং সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সমর্থনে বৃটিশ অত্যাচারের নিন্দামূলক চিঠিপত্র প্রকাশ করেন (২৫শে নবেম্বর ১৮৫৬-র সংখ্যা দ্রষ্টব্য।) বিনয় ঘোষ লিখেছেন, 'গৌরীশঙ্কর যে বাস্তবিকই কতদূর সাহসী ছিলেন তা ভাস্করে প্রকাশিত এই পত্রখানি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। সমসাময়িক কোন পত্রিকায় এর তুলনা খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন।' ["সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র" (৩) পৃ. ৩৩৯-৪০ ; পৃ. ৫৫] গৌরীশঙ্কর বৃটিশশাসকদের আইন-মাফিক প্রজাপীড়নের নিন্দা করে লিখেছিলেন, 'রাজা প্রজাদিগের নিকট শঠতাপূর্বক ধনাপহরণ কার্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সুনিপুণ হইয়াছেন পৃথিবীর কোন অংশে এতদ্রূপ সুদক্ষ রাজা আছেন কি না আমরা বলিতে পারি না।' (সম্পাদকীয়, ১৮৫৭, ৭ ফেব্রুয়ারি)

পাথুরিয়াঘাটার জমিদার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের অর্থে প্রথম প্রকাশিত, এবং কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত "সংবাদ প্রভাকর" নীলকর এবং তালুকদার মহাজনদের অত্যাচারের সমালোচনা করলেও জমিদারদের সমর্থক ছিল। এই পত্রিকার মতে মহাজনের হাত থেকে কৃষককে রক্ষা করার প্রধান দায়িত্ব ছিল সরকার-বাহাদুরের। বলা হয়েছিল, 'কেহ ২ ভূম্যধিকারিগণের প্রতি সকল দোষ অর্পণ করেন, কিন্তু প্রকৃত বিবেচনায় তাহা কোনমতেই গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না ; কারণ জমিদারেরা ভূমির নির্ণীত জমাই গ্রহণ করিয়া থাকেন।' [বিনয় ঘোষ, তদেব (১), পৃ. ৮৪, ৯৫]

সুবিখ্যাত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র দৃষ্টিভঙ্গী কৃষকদের ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এই পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। [বিনয় ঘোষ, তদেব (২), পৃ. ১০৮-১৩১] বিনয় ঘোষের মতে প্রবন্ধটি অক্ষয়কুমার দত্ত লিখেছিলেন। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী ভাষায় ও সুন্দর বিশ্লেষণের সাহায্যে সমসাময়িক জমিদারদের কৃষক-শোষণের কলঙ্ক-লাঞ্ছিত চিত্রটি আঁকা হয়েছে। ১৮ রকমের দৈহিক অত্যাচারের বিবরণ থেকে শুরু করে নানাধরনের অর্থ নৈতিক ও পুলিশি উৎপীড়নের বিবরণ অসাধারণ ভাষায় মর্মন্তুদ রূপে ফুটে উঠেছে। অথচ, প্রবন্ধলেখক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও শোষণ বন্ধ করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট ও ব্যবহারিক উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেননি। তথাপি, তৎকালীন বাঙালী-কৃষকের দুরবস্থা বর্ণনামূলক দলিল হিশেবে এই প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

জমিদারি অত্যাচার বর্ণনমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধের দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নব-মূল্যায়ন, এবং সংস্কার। দ্বিতীয়, জমিদারদের একটু সাবধান করে দেওয়া। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রচলিত জমিদারি আইনের কিছুটা সংস্কার করা হয়। প্রটেস্টান্ট পাদরিরা এই সংস্কার আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের রাজস্ব বিষয়ক নতুন আইনে প্রজাদের কাছারিতে নিয়ে এসে জমিদার ও জমাদারদের উৎপীড়ন বন্ধ হয়। বেআইনি খাজনা আদায়ের ব্যাপারে একটু অসুবিধা হতে থাকে। কিন্তু এই আইনে ঠিকে-চাষী বা ভাগচাষীর কোন সুবিধা হয়নি। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের রাজস্ব আইন মেনে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১২৬৭ বঙ্গাব্দে "সংশোধিত নিয়মপত্র" নামক বিপুলকলেবর বই ছাপান। বইটিতে 'রঙ্গপুরাদি প্রদেশান্তর্গত' কতগুলি জমিদারির পূর্ণ বিবরণ আছে। এই বইয়ের ৪৫ পৃষ্ঠায় প্রজাদের চার কিস্তিতে (আষাঢ়, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন) খাজনা দেওয়ার বিধি বর্ণিত হয়েছে ; বলা হয়েছে, 'যদিও আইনে প্রজার বাকী খাজানার নিমিত্ত শস্য ক্রোক বিক্রয় করণে ভূম্যধিকারীর সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে ; কিন্তু তাদৃক্ ক্ষমতা জারী করাতে সর্ব্বদা প্রজাগণের ক্লেশ-সম্ভাবনা ও ব্যক্তি বিশেষের অবৈধ উপায়ের বিশেষ কারণ হইতে পারে, অতএব ঐরূপ শস্যাদি ক্রোক করা বিশেষ কারণ ব্যতীত কর্তব্য নহে।'

দেশী জমিদাররা বহুদিন আগে থেকেই নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার চেষ্টা করছিল। দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটকে দেখা যায়, নীলকরদের অত্যাচারে একটি ভাল জমিদার বংশের সর্বনাশ হয়। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং 'হিন্দু' গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও শিশিরকুমার ঘোষ নীলকরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। [দ্র. J. C. Bagal, *Peasant Revolution in Bengal*, Calcutta, 1953.]

নীল-বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০)-এর নেতা ছিলেন কিছু বুদ্ধিজীবী, কিছু জমিদার, জোতদার এবং মহাজন। এ-ধরনের নেতৃত্ব নীল-বিদ্রোহকে একটি ব্যাপক প্রজা-বিদ্রোহে পরিণত হতে দেয়নি। বুদ্ধিজীবীরা জমিদারদের মধ্যে বহুকাল আগে থেকেই ভালমন্দের শ্রেণীবিভাগ করে ফেলেছিলেন। নীল-বিদ্রোহের ফলে 'ভাল' জমিদারদের ক্ষতি হোক্—এ তাঁরা চান নি। নীল বিদ্রোহের পরে 'স্বদেশী' জমিদাররা বহাল তবিয়তেই রইলেন। পাবনার প্রজাবিদ্রোহের (১৮৭৩) সময় রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছিলেন : 'It is a matter of regret, though not perhaps of surprize, that most of the leading newspapers of the Bengali Community should have taken an entirely one-sided view of the question, and passed unmitigated censure on the acts of the ryots of Pubna." (R. C. Dutt, *An Apology for the Pubna Rioters*, reprinted in *Nineteenth Century Studies*, No. 3) যে-সব পত্রিকা এককালে নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল, দেশী জমিদারদের বিরুদ্ধে পাবনার প্রজা-বিদ্রোহে তারা জমিদারদেরই সমর্থন করল।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের, এবং তাঁদের পরিচালিত পত্রপত্রিকার সমর্থনে দেশী জমিদারদের মধ্যে কেউ কেউ যে কত উদ্ধত হয়ে উঠেছিলেন, তার প্রমাণ, জমিদার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত 'On the condition of the Bengal Ryot' প্রবন্ধ। এটি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে Bengal Social

Science Association-এর চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে লেখক কৃষকদের দুঃখকষ্টের জন্য কৃষকদেরই দায়ী করেন, কৃষকদের মামলা-মোকদ্দমা করার তীব্র সমালোচনা করেন, এবং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, কৃষকদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের কোনই প্রয়োজন নেই। আসলে মামলা-মোকদ্দমা ত জমিদাররাই করত। এক বছরে বর্ধমানের কৃষকদের বিরুদ্ধে ত্রিশ হাজার মামলা করেছিল, তারও নজির আছে। (*Calcutta Review*, Vol. VI, P. 318) তৎকালীন সরকার কৃষকদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আগ্রহ দেখায় নি। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতি জেলায় মাত্র ১০০টি পাঠশালা প্রতিষ্ঠার জন্য বাৎসরিক হারে মাত্র বারো হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু গভর্নর গ্রাণ্ট সাহেব তার আগেই ঠিক করেছিলেন, এ-সব পাঠশালায় ইংরাজি শেখানো হবে না ; 'he would restrict the improved course to the measurement of land, to some short Bengali grammar, and to the very first elements of Geography and Indian History.' এই ব্যবস্থাই চালু করেন গভর্নর বীডন্ সাহেব। (দ্র. Buckland, *Bengal under the Lieutenant Governors*, Vol I) প্যারী মুখুয্যের মত জমিদাররা কৃষকদের শিক্ষার জন্য এই সামান্য ব্যবস্থাও পছন্দ করেন নি। কৃষকদের পদতলে রেখে এই নিদারুণ শোষণের অবসানের সম্ভাবনা দেখা গেল না। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ভয়ে ভয়ে লিখলেন : 'কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে?' তিনি সরকারের কা[illegible] সময় থাকতে আবেদন করলেন : 'আমরা এই দীন হীন ছয় কোটি বাঙ্গালী কৃষকের জন্য তাঁহাদের নিকট যুক্ত করে রোদন করিতেছি—তাঁহাদের মঙ্গল হউক। ইংরাজ রাজ্য অক্ষয় হউক। তাঁহারা নিরুপায় কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।'

কৃষকদের সম্পর্কে তথাকথিত রেনেসাঁসের চিন্তা শেষ পর্যন্ত পূর্বের মত ঐ 'রোদন' এবং 'যুক্ত করে' আবেদনেই শেষ হল।

রাজনগর

অমিয়ভুষণ মজুমদার

বাগচীর ঘুম ভেঙেছে কিন্তু এখনও সে শয্যায়। রোজ সকালে ছটায় সে শয্যা ত্যাগ করে, আজ এখন সাড়ে ছটা বাজে। সে অসুস্থ বোধ করছে কি? বরং উল্টো। তার গায়ের উপরে হাল্কা কম্বল। শয্যার উপকরণে এ পরিবর্তনটা কালই ঘটেছে। বালাপোষের পশমী কম্বল। কারণ এখন নভেম্বরের মাঝামাঝি হলো। আর তা যেন সে অনুভব করছে। তার ভাব দেখে মনে হয় যেন বা আজ স্কুল বসবে না। এটা ভুল, কিন্তু হিসাব করলেও হাল্কা অনুভূতিটা নষ্ট হয় না। বরং উল্টো। কাল দেয়াল ক্যালেণ্ডার যেন তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে আগামী সপ্তাহে রবিবার ছাড়াও স্কুলের একটি বন্ধ আছে, তারপর রানীমার জন্মোৎসবের বন্ধ, তারপর স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা। আর তারপরই ক্রিস্টমাসের ছুটি। বেশ কাজ করার অবসর, বেশ খুশী হওয়ার সময়।

কখনও কখনও মনের মেজাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েই ঘটনা ঘটে। আধঘণ্টা আগেকার আয়নার দুষ্টুমির ঘটনাটা মনে করা যেতে পারে। সাধারণত বাগচী কেটের আগে শয্যা ত্যাগ করে। সুতরাং সে অসুবিধা রোজ হয়না আজ যা হয়েছিলো রাত্রিবাস নিয়ে। কারো রাত্রিবাস ল্যাভেণ্ডারগন্ধ মসলিনের শেমিজ হতে পারে যার বুকের কাছে চেরা, একটা ফিতেতে ধরে রাখা, যার ঝুল হাঁটু পর্যন্ত পৌছায় মাত্র। কেট নিশ্চিত ছিলো যে বাগচী ঘুমিয়ে আছে। উপরন্তু শয্যার দিকে পিছন ফিরেই আয়নার দিকে মুখ রাখা যায়। সুতরাং সে নিশ্চিন্ত ছিলো। কিন্তু আয়নার প্রতিবিম্বর মুখ তো শয্যার দিকেই। এবং সেজন্য বক্ষ-বর্তুল যার রং যেন হাতির দাঁতের এবং উরুর মসৃণতা যা যেন শ্বেতপাথরের তা বাগচীর সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে পড়ে থাকবে।

এই সময়ে বাগচী ভাবলো এবারের ক্রিস্টমাস কেটকে নিয়ে কলকেতায় কাটালে হয়। গতবার রাজকুমার ক্রিস্টমাসে কলকেতায় যাবেন কথা ছিলো। তখন সঙ্গী হওয়ার নিমন্ত্রণ ছিলো। কিন্তু ব্যাপারটা তেমন ঘটেনি। রাজকুমার ইস্টারে গিয়েছিলেন।

হাত বাড়িয়ে কেটের পরিত্যক্ত বালিশটায় হাত রেখেছিলো বাগচী। এই পরিতৃপ্তির ক্ষণে শয্যা ত্যাগে বিলম্ব হলো এবং সে ভাবলো স্কুলের পরীক্ষার কথা, কারণ তা পরীক্ষা নেয়ার পরীক্ষা হতে চলেছে—নতুন এবং দুঃসাহসিক। পরে রলের চিঠির কথা মনে এলো কারণ তা নতুন বিষয়গুলোর মধ্যে সব চাইতে নতুন। কাল সন্ধ্যায় চরণদাস দিয়েছে চিঠিখানা।

বাগচী এখন ভাবলো বানানটা যাই হ'ক তার নামের উচ্চারণটা রলেই হবে। বানানের কথা আর বলো না। তার নিজের নামটা রলে যেভাবে লিখেছে ঠিকানায় তাতে সে চান্দরকাণ্ট বাক্কি হয়ে যায়। কিন্তু আসল কথাটা এই রলে এদিকে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে মিশন হাউস স্থাপন করতে চায়। চিঠির ভাষাটা ভদ্র, এবং সুরুতে রেভরেণ্ড ফাদার বাগচী থেকে শেষের কাইণ্ডেস্ট রিগার্ড পর্যন্ত ইংরেজিটা বিশুদ্ধ এবং মৃদু। কীবলের পরিচয় থেকেই এই চিঠি।

গৃহকর্ত্রী কেট প্রবেশ করলো, তার জ্যাকেটের হাতা গুটানো, কোমরে অ্যাপ্রন বাঁধা। বোঝা

যায় সে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছিলো। বাগচীর ঘুম দেখে তার ফিরে যেতে ইচ্ছা হলো, কিন্তু সে সুযোগ ছিলো না। সুতরাং সে শয্যাপ্রান্তে এসে ডাকলো বাগচীকে। বললো,—অতিথি এসেছে যে।

—কে? রলে নাকি? এই বলে উঠে বসলো বাগচী।

—রলে? কেট এই নতুন নামে অভ্যস্ত নয়। সে ভাবলো ধূমপানের পথিকৃৎ সার ওয়াল্টার রলের সঙ্গে নিজের পাইপকে যার এখনই খোঁজ পড়বে তাকে মিশিয়ে এই রসিকতা। সে বললো রসিকার সুরে,—ওই যে যাঁর প্রার্থনা ও গড্ মেক্ মি এ সেণ্ট বাট নট ইয়েট্। (হে ঈশ্বর আমাকে নামে সন্ন্যাস দাও কিন্তু এখনই নয়।)

বাগচী অবাক হলো।—বলো কি? কে?

—দু-এক মুহূর্ত ভাবলো সে। তারপর হেসে উঠলো আন্দাজ করে।

—ব্রেকফাস্টে বসতে বলেছো নিশ্চয়ই। দেখো দেখি কি লজ্জা! কত বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছি।

কেট বললো,—ব্রেকফাস্টে বসবেন না। পরে নিজেই ভেবে বললেন পাছে আমরা ভাবি আমাদের ছোঁয়া খেতে বা আমাদের টেবলে বসলে ওঁর জাত যাওয়ার ভয়, সেজন্যই তোমার টেবলে বসে চা বা কফি এক কাপ খাবেন।

বাগচী বললো,—তা হলে তো ঠিক ধরেছি। ভদ্রলোক সব সময়েই ভেবে কথা বলেন, ভেবে কাজ করেন।

সে তোয়ালে নিয়ে গোসলখানায় যেতে যেতে দাঁড়ালো। কেটের চিবুকের নিচে দুই আঙুল রেখে বললো,—কিন্তু ও গড্ মেক মি এ সেণ্ট্ বাট্ নট্ ইয়েট্ এই প্রার্থনা প্রকৃতপক্ষে কার বলো তো?

—কেন, সেণ্ট টমাসের নয়?

বাগচী বললো, কেটের চিবুকটাকে ঈষৎ উঁচু করে,—আমার। রেভরেণ্ড বাগচীর।

বাগচীর বাইরের ঘরে যে বসেছিলো সে সর্বরঞ্জন প্রসাদকুসুম নিয়োগী। বাগচীর স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। প্রায় এক বৎসর সে এই গ্রামে। কিন্তু এখনও অনেক পরিস্থিতিতেই তাকে নতুন বলে মনে হয়। কারো চরিত্র অদ্ভুত রকমে দানা বাঁধা থাকে। একবার দেখলেই যেন তাকে চিনে নেয়া যায়। কেট যা বলেছিলো তা অবশ্য তার বাইরের চেহারা দেখে। এর আগেও একদিন তাকে সর্বরঞ্জন প্রসাদ কুসুমের আসার কথা বাগচীকে জানাতে হয়েছিলো। সেদিন সে বলেছিলো সেণ্টফ্রান্সিস্ অব অ্যাসিসি। সর্বরঞ্জন প্রসাদের দিকে চাইলেই প্রথম যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা তার শ্মশ্রু; সেই সুপ্রচুর আবক্ষবিস্তৃত দাড়ি যা আকারপ্রকারে মহাসন্তেরই হতে পারে তা শুধু ঘনকৃষ্ণ বলে যেন ঘোষণা করছে এখনই তা শুভ্র হতে চায় না। তার পরনে কালো চীনাকোট এবং ডাচ্ ট্রাউজার্স। একেবারে কলকেতার আধুনিক কাটছাট। সম্ভবত তা ক্ষারে কাচা এবং ইস্ত্রি করাও হয় নি। যেন পোশাকটা ঘোষণা করছে সর্বরঞ্জন কতটা সাদাসিধে এবং মিতব্যয়ী কিন্তু অন্যদিকে কতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ক্লিনলিনেস ইজ নেকস্ট্ টু গডলিনেস, তাতে সন্দেহ-কি?

বসবার ঘরে ঢুকে নিয়োগিকে দেখে বাগচীর মনে পড়লো কেটের রসিকতা। সে প্রফুল্লবোধ করলো। কারো কারো রসিকতায় ব্যঙ্গের আড়ালেই স্নেহ ভাবটাই বরং প্রবল।

সর্বরঞ্জন হেসে বললো (এখানে আমাদের বলে নেয়া দরকার বারবার তার এই পুরো নামটা

অর্থাৎ সর্বরঞ্জন প্রমাদকুসুম তা যতই আধুনিক হক এবং একেবারে ইংরেজদের নামের তিনটি সমাহার হলেও উল্লেখ করা অসুবিধার হবে।),—আমি একটু ভুল করেছি, সার, আমার ধারণা ছিলো আপনি ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে থাকেন।

—ব্রাহ্মমুহূর্ত? বাগচী চশমার কাচ রুমালে মুছে, চোখে দিয়ে, সর্বরঞ্জনের দিকে চাইলো।

—উপাসনার সেইটি প্রকৃষ্ট সময় নহে কি? এবং যেহেতু আপনি ধার্মিক, সুতরাং উপাসনা করে থাকেন, এবং সুতরাং ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করতে অভ্যস্ত, এতে আর সন্দেহ কি?

বাগচী বললো,—আপনি অবশ্যই ব্রাহ্মমুহূর্তেই উপাসনা করেছেন!

সর্বরঞ্জন মাথাটাকে একবার ডান কাঁধ আর একবার বাঁ কাঁধের উপরে ছোঁয়ালো। তার মুখে একটা উজ্জ্বল হাসি দেখা দিলো, অবশ্য সেই প্রচুর কালো দাড়ির মধ্যে হাসির পক্ষে যতটা উজ্জ্বল হওয়া সম্ভব। সে বললো,—ওটাই কি ডায়েরিতে দৈনিক হিসাবে জমার দিকে প্রথম অঙ্কপাত হয় না?

ব্রেকফাস্টের আগে কেউ যদি বাড়ি বয়ে এসে প্রার্থনার কথা আলোচনায় আনে তবে তাতে একটা কৌতুকের দিক থাকে। কিন্তু ব্যাপারটা বাগচীকে চিন্তার বিষয়ও এনে দিলো। প্রকৃতপক্ষে তার প্রার্থনাগুলো কি সংখ্যায় অনেক কম হচ্ছে না?

বাগচী যেন অপ্রতিভ ভাবে বললো,—নিশ্চয়ই প্রার্থনা-সব সময়েই জমার দিকে পড়ে।—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার জমা অনেক কম।

সর্বরঞ্জন দাড়িঢাকা চিবুকটাকে উঁচুনিচু করলো। সে কি বিব্রত? অথবা আনন্দিত? বাগচীর তুলনায় প্রার্থনার ব্যাপারে অগ্রসর থাকায় সে মনে মনে একটা উল্লাসই যেন অনুভব করলো। কিন্তু সুশিক্ষা এ ধরনের উল্লাসকে গোপন করতে বলে না? সুতরাং তা গোপন করতে গিয়ে যথেষ্ট বিব্রত বোধ করলো সে।

বাগচী বললো,—মিস্টার নিওগি, আপনার নিশ্চয় গুরুতর কিছু প্রয়োজন আছে। আপনি ইচ্ছা করলে এখনই তা বলতে পারেন। সঙ্কোচ করার কিছু নেই। আপনি কি স্কুলের নতুন পরীক্ষা-বিধি সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

সর্বরঞ্জন বললো,—আমি আপনাকে অন্য বিষয়ে কিছু বলতে এসেছিলাম, কিন্তু কথাটা যখন উঠে পড়লো তখন বলি। আজ তো স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য পরীক্ষক নির্বাচন করা হবে। এই সুযোগে সম্পূর্ণ বিষয়টাকে আমি আপনাকে আর একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করবো কি? এমন কি স্কুলের নবনিযুক্ত শিক্ষক শিরোমণি মশায়ও এই মত পোষণ করেন যে ব্যাকরণজ্ঞান না হলে, শব্দকে শুদ্ধভাবে না জানলে, বিদ্যাশিক্ষার কোন উপায়ই নেই। মৌখিক পরীক্ষায় কি ব্যাকরণ, বানান প্রভৃতি বিষয়কে ফাঁকি দেয়া হবে না?

বাগচীর মনে পড়লো মাত্র কয়েকদিন আগে শিরোমণিকে সংস্কৃত পড়ানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। স্কুল সম্বন্ধে তার অভ্যস্ত চিন্তায় যে কটি মানুষের কথা মনে আসে শিরোমণি এখনও তার মধ্যে একজন নয়।

বাগচী বললো,—এটা তো একটা পরীক্ষামাত্র কিংবা পরীক্ষার পরীক্ষা বলতে পারেন। যদি

আমরা দেখি এটা ব্যর্থ হচ্ছে তা হ'লে আগামী বছর থেকে পরিবর্তন করে পুরনো বিধিতে যাওয়া যেতে পারবে। তবে আমি এখনও বিশ্বাস করি হিমালয় কথাটাকে ঈকার দিয়ে লিখলে বা ভাবলে তার উচ্চতা কমে না, সে অঞ্চলের তুষারে এতটুকু হ্রাসবৃদ্ধি পায় না।

—কিন্তু এর একটা অন্যদিক আছে, সার, কিছুদিন পরে পুস্তকগুলি ভাষার ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে না?

—আমাদের এই ছাত্ররা যখন বই লিখবে তখন। সেটা খুব দূরবর্তী ব্যাপার—তা ছাড়া বানান কোন ভাষাতেই স্থির নয়।

—তাও যদি মেনে নেয়া হয়, কলকেতা থেকে পৃথক পথে চলে আমরা কি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে আলোক থেকে সরে যাচ্ছি না অথবা প্রধান স্রোত থেকে বিযুক্ত হচ্ছি না? কলকেতায় যা হয় এখানেও কি তা হওয়া উচিত নয়? বিদ্যালয়-পরিদর্শককে এমন অবহেলা করা কি উচিত? বাগচী হাসলো, বললো,—বরং উল্টো। কলকেতার লোকসংখ্যা বেশী? তাদের সংস্কৃতিকে কি দেশের বলতে হবে নাকি? সেটা কি একটা ভয়ঙ্কর রকমে অস্বাভাবিক জায়গা নয়? সেখানে কি ইংরেজির কয়েকটা শব্দ জানাকে সংস্কৃতির লক্ষণ মনে করা হচ্ছে না?

নিওগি বললো,—সার, আপনার প্রশ্রয় আমাকে তর্ক করতে সাহসী করছে। ইংরেজি ভাষাকে শুদ্ধভাবে লিখতে পড়তে জানার উপরে নিশ্চয়ই জোর দেয়া হচ্ছে। কিন্তু তা কি অন্যায়? রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণ কি ইংরেজি শিক্ষার গুণগ্রাহী নন?

বাগচী বললো,—রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়ের পাণ্ডিত্য শ্রদ্ধার বিষয়, কিন্তু তাঁরা কি ইংরেজি কাব্য ইত্যাদি পড়ে পণ্ডিত? আমি তো শুনেছি রাজা রামমোহনের শিক্ষা সংস্কৃত আরবী ফার্সী প্রভৃতিতে এবং বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কাব্যালঙ্কার ইত্যাদিতেই জ্ঞানসমুদ্রস্বরূপ। কিন্তু আসল কথাটা তা নয়। আপনি কি এ গ্রামের চাষীদের সঙ্গে মিশেছেন? আপনি কি তাদের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে আলাপ করেছেন কিংবা রামায়ণ মহাভারত নিয়ে। তা হলে দেখতেন তারা ধর্ম ও কাব্য সম্বন্ধে এত জানে এবং তা কখনও কখনও এত গভীর যে আপনি তাদের কখনই মূর্খ বলতে পারতেন না, বরং সংস্কৃতিবান বলে বিবেচনা করবেন, যদিও তারা এক অক্ষরও পড়তে জানে না।

—সেটা হয়তো কথকতা ইত্যাদির ফলে হতো। কিন্তু তাদের সেই জ্ঞানকেই কি আপনি কুসংস্কারের উৎস বলেন না?

—অনেকাংশে তাদের ধ্যানধারণা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন।

—তা হলে, সার, ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে কুসংস্কারহীন জ্ঞানলাভই কি আমাদের উচিত হচ্ছে না?

—কিন্তু ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সে সুযোগ আমরা কতজনকে দিতে পারছি? আর আমাদের এ আলোচনাটাও পুরনো। যারা ইংরেজির বিদ্যাসাগর হবে তারা তা হোক। তার সংখ্যা ইংরেজদের দেশেও কয়েকজন মাত্র। কিন্তু ইংরেজের কুসংস্কারহীন জ্ঞান বলতে যা বুঝি তা সবই ব্যবহারিক বিষয়ে, সেটা লিখতে ওরা বইএর ভাষা মুখস্থ করে না। চাইছি যে আমাদের ছাত্ররা আপাতত ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কিছু জানুক—তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তাদের

কুসংস্কারাচ্ছন্ন জ্ঞান দূর করতে এবং আধুনিক জ্ঞানে পৌঁছে দিতে যে সময়ের ব্যবধান সেটা কমাতে চাইছি। শুধু ইংরেজি ভাষার উপরে জোর দিলে ইংরেজনবিশ একটা সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণী তৈরী হবে, যারা সকলকে মূর্খ মনে করার সুযোগ পাবে। সেকালের পণ্ডিতরা তবু তো এদেশের মানুষই ছিলো। সাধারণ যে কাব্য সম্বন্ধে ধর্ম সম্বন্ধে সহজভাবে জানতো তা তারা আরও গভীর ও বিশদ করে জানতো। এরা একেবারে অন্যদেশের হয়ে যাবে। এদেশে মূর্খ ছাড়া আর কেউ থাকবে না তখন।

এই বলে বাগচী হেসে উঠলো। কিন্তু আলোচনাটাকে গুটিয়ে দিতে সাহায্য করলো কেট। সে ঘোষণা করলো ব্রেকফাস্ট দেয়া হয়েছে। তখন আবার বাগচী নিওগিকে অনুরোধ করলো ব্রেকফাস্টের অংশ নিতে, বাকি আলাপটা টেবলে হতে পারবে বললো। নিওগি তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জানালো প্রাতরাশ তার ইতিপূর্বে হয়ে গিয়েছে। আলাপের বিষয়টাকে এখন মূলতবী রাখা যেতো, কিন্তু যেহেতু কেউ মনে করতে পারে সে এতদূর কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে ক্রিশ্চানদের সঙ্গে একই টেবলে বসতে অনিচ্ছুক, তা যে নয় তা প্রমাণ করার জন্যই টেবলে বসে এক কাপ কফি সে খাবে।

সুতরাং প্রাতরাশের টেবলে বসলো তারা, বাগচী, কেট, এবং নিওগি। এই সময়ে একবার মনে হয়েছিলো কেটের, নিওগির এই প্রমাণ করার ব্যাপারটা এদেশের খাওয়া-না-খাওয়ার সেই অদ্ভুত ব্যাপারেরই অংশ, কিন্তু যেভাবে নিওগি এই প্রমাণ করার সুযোগটাকে চেপে ধরছে তা হাস্যকর, কিন্তু একই টেবলে বসে এখন অতিথি এবং তাকে নিয়ে হাসা উচিত হবে না।

বাগচীর স্বভাবতই (অভ্যাসবশে) রলের চিঠিটার কথা মনে হলো। ব্রেকফাস্টে চিঠি পড়া অভ্যাস তখনও কারো কারো ছিলো। চিঠিটা তার পকেটেই। চামচ রেখে একবার সে পকেটে হাতও দিলো। কিন্তু চিঠি পড়তে গিয়ে এবং সে বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়ে সে যদি অন্যমনস্ক হয় তাতে নিওগির প্রতি অনাদর দেখানো হবে। বলে লিখেছে সে এ অঞ্চলে একটা মিশন হাউস করতে চায়, এবং সে বাগচীর সাহায্য প্রার্থনা করেছে। কীবলের কাছেই বাগচীদের সংবাদ পেয়েছে সে। সংবাদের এই সারাংশ আবার মনে এলো তার।

কিন্তু সে সর্বরঞ্জনপ্রসাদের দিকে ফিরে বললো,—বলুন মিস্টার নিওগি, আমি কোন্ বিষয়ে আপনার কাজে লাগতে পারি। প্রকৃতপক্ষে আপনার দরকারী কথা না বলে আমরা এতক্ষণ অন্য কথা বললাম।

সর্বরঞ্জনপ্রসাদ বললো,—সমস্যা দুরকম সার। আমি গতকাল স্কুল থেকে বাড়ি যাওয়ার আগে এ বছরের ছুটির তালিকা এবং আগামী বৎসরের ছুটির তালিকার খবরটা দেখছিলাম।

বাগচী আগ্রহসহকারে নিওগির দিকে চাইলো।

—দেখলুম, রানীমার জন্মতিথির উৎসবের আগে লাল কালিতে নতুন একটা ছুটি বসানো হয়েছে রাসপূজা উপলক্ষে। এবং আগামী বৎসরের তালিকার খসড়ায় দেখলুম দুর্গাপূজা ছাড়াও কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ইত্যাদি তো আছেই, শিবচতুর্দশীর তিথিতেও দুদিন ছুটি।

বাগচী বললো,—রাসপূজার কথা আমার জানা ছিলো না। শিরোমণির অনুরোধে সেই উপলক্ষে একদিন ছুটি দেয়া হয়েছে। সেজন্যই বোধ হয় লাল কালির কারেকশান। আর আগামী বছরের

শিবচতুর্দশীতে দুদিন ছুটির কারণ রানীমা ফরাসডাঙ্গায় যে শিব স্থাপন করেছেন, শুনতে পাচ্ছি সে উপলক্ষে ভারি বড় মেলা হবে। হয়তো কাছারী ইত্যাদিও বন্ধ থাকবে।

—এ ব্যাপারে, সার, দেওয়ানজিরও কি এই মত?

—তিনি স্কুলের এসব ব্যাপারে মতামত দেন না।

—তা হলেই তো দেখুন, সার, এসব অন্যায়ের সব দায়দায়িত্ব আমাদেরই থেকে যাচ্ছে। এই বলে সর্বরঞ্জন প্রসাদকুসুম বেশ খানিকটা মাথা ঝাঁকালো।

—কিন্তু ছুটি দেয়া হয়েছে, এখন আর বন্ধ করা যায়?

নিওগির মুখ দাড়ি সত্ত্বেও লাল হয়ে উঠলো। সে বললো, আপনি আমার উপরওয়ালা। ডিসিপ্লিনের জন্য আপনার কথা আমাকে মানতেই হবে, হাঁ তা মানতেই হবে; কিন্তু এও আমি বলে দিচ্ছি, এতে আমার অন্তরলোকের সায় নেই। প্রত্যেকের একটা মিশন আছে। আমাদের ছাত্ররা যদি তার পিতামাতার অন্ধকারাচ্ছন্ন পুতুলপূজার মানসিকতায় ফিরে যায় তবে বৃথাই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, বৃথাই শিক্ষকতা করা।

বাগচী বললো,—ছাত্রদের মাতাপিতারও মত থাকতে পারে।

—অন্যায়ও মানতে হবে?

—অন্যায় বলছেন?

—অন্যায় নয়? রাসের কথাই ধরুন। ওটার মতো কুৎসিত জঘন্য নীতিহীন কিছু হতে পারে? লাম্পট্য ছাড়া কিছু বলবেন?

—ওটা তো ধর্মের ব্যাপার, শিরোমণি বলছিলো।

সর্বরঞ্জনের মুখে যেন আলো পড়লো, জমকালো দেখালো তাকে। ধর্মের ব্যাপার এবং নীতি-হীন—এটাই তো সে বলতে চাইছিলো। ব্যাপারটার নীতিহীনতাকে আক্রমণ করলে ধর্মকেও সার্থকভাবে আক্রমণ করা যায় এক্ষেত্রে। এটাই তো আর একবার প্রমাণিত হলো প্রতিমাপূজার ধর্ম কত আবিলতা সংগ্রহ করতে পারে।

সে বললো,—তা হলেই দেখুন। সঙ্গে স্ত্রীলোক না থাকলে আমি বলতে পারতুম রাস ব্যাপারটা কতটা নীতিহীন।

সর্বরঞ্জনপ্রসাদের মুখের দাড়িহীন অংশটুকু লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। বাগচী বললো, —আপনি এ বিষয়ে শিরোমণি মশায়ের সঙ্গে আলাপ করে নিন। আপনার মত তাঁকে জানান। নীতিহীন ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া যায় না। আপনার বাড়ির খবর বলুন। ছেলেপুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকছে তো? আপনার স্ত্রীর কি এই সমাজে কিছু অসুবিধা হচ্ছে? আপনার বাসগৃহ সম্বন্ধে কোন অসুবিধা নেই তো?

সুতরাং আলাপটা কিছুক্ষণ সর্বরঞ্জনের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে চললো। কফি ও বিস্কুট দিয়েছিলো ইতিমধ্যে কেট। সর্বরঞ্জন তা গ্রহণ করে উৎফুল্ল হলো। তা যে শুধু বিস্কুটের স্বাদ বা কফির তৈরি করার গুণে তা বললে সর্বরঞ্জনপ্রসাদকে হীন করা হবে। সুনীতি সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে কার না সুখ? প্রাতরাশে কেট ও বাগচীর আলাপ হয়। বিবাহের পর থেকে

একদিন এতবার তারা প্রাতরাশেই তো কথা বলেছে, অন্য সময়ের আলাপের কথা যদি নাও বলা হয়, কি আশ্চর্য, তা সত্বেও তাদের কথা ফুরায় না। আজ তো রেভরেণ্ড রলের চিঠিটা নিয়েই আলাপ করবে স্থির করেছিলো বাগচী। কেট সর্বরঞ্জনপ্রসাদকে আরও কিছু খেতে অনুরোধ করে ভাবলো, এসব হয়তো আমার ভাবা উচিত নয়, কিন্তু ভদ্রলোকের দাড়িটাকে অন্যের বলে মনে হয় যেন। ধর্মাচার্যরা দাড়ি রাখেন। ইনি কি নিজের অজ্ঞাতে তাঁদের কারো মাথা নেড়ে কথা বলার ভঙ্গিটাকে গ্রহণ করেছেন? অন্য একবার ভাবলো ছুটির ব্যাপারটা কত সিরিয়াসলি নিয়েছেন দেখো যে ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে চলে এসেছেন, কারো প্রাতরাশে ব্যাঘাত হয় কি না হয় তাও ভাবার অবসর পান নি।

সর্বরঞ্জনপ্রসাদের বাসগৃহের সুখসুবিধা, আসবাবপত্রের অপ্রতুলতা—সে সম্বন্ধে দেওয়ানজিকে অনুরোধ করার বাগচীর আশ্বাস প্রভৃতির মধ্যে প্রাতরাশ শেষ হলে বাগচী পাইপ হাতে টপ্ হ্যাট মাথায় স্কুলের জন্য রওনা হলো। অন্যান্য দিনের মতো পাইপ মুখে বসবার ঘরে বসে কেটের সঙ্গে আর কিছুক্ষণ আলাপ করার সুযোগ ছিলো না।

পথে বাগচী ভাবলো গত বৎসর যে ছুটিগুলি দেয়া হয়েছিলো এবার তার থেকে কয়েকটা দিন বেড়েছে। সে অনুপাতে গ্রীষ্মের ছুটি এবং ক্রিস্টমাসের ছুটি কমানো হয়েছে। গত বৎসর কিন্তু কেউ ছুটি নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করেনি। সে ভাবলো, তা বৈ কি, একটা ব্যক্তিত্ব বৈ কি—সর্বরঞ্জনকে দেখলে একটা শক্ত কিছু বলেই মনে হয়। গতবার সে ছিলো বটে, কিন্তু এত নতুন ছিলো খেয়াল করেনি এসব বিষয়ে। এবার সে আছে, কিছু তফাৎ হবেই।

এখন সকালের রোদ পথে। উজ্জ্বলতায় এবং কবোষ্ণতায় তা তৃপ্তিদায়ক। বাগচী ভাবলো, এই বৎসরের শেষ কটা মাস উৎসবমুখর হবে। রানীর জন্মতিথির উৎসবের সঙ্গেই কালীপূজা, তার আগে রাস, তারপর স্কুলের পরীক্ষা, অবশেষে ক্রিস্টমাস। ছাত্রদের প্রমোশন তারপরে। আজ যখন সকালেই বেরিয়ে পড়েছে মৌখিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলো যা তৈরি হয়েছে সেগুলোকে সে পরীক্ষা করতে পারে।

কিন্তু সর্বরঞ্জনপ্রসাদ বললো,—সার, দ্বিতীয় বিষয়টার দিকেও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এবার এ গ্রামে নাটক হচ্ছে।

—নাটক? মানে থিয়েটার? কলকাতার হুজুগ এসেছে বটে। হঠাৎ হচ্ছে যে?

—রানীমার জন্মতিথির উৎসবে।

—বাহ্। অন্যান্যবার শুনেছি যাত্রা হয়। আপনি নিশ্চয়ই আমন্ত্রিত হবেন।

—তা হয়তো হব। কিন্তু থিয়েটার বলে কথা। তা কি আরও বাস্তব বলে আরও সত্য বলে প্রতিভাত হয় না?

—তা হয়তো হব। অন্তত অবিশ্বাসটা কিছুক্ষণ দূরে থাকে বোধ হয়।

—আমাদের ছাত্ররা কি তা দেখবে না?

—খুব সম্ভব দেখবে। শুনেছি রাজবাড়ির সদর দরজা সে রাতে বন্ধ হয় না।

—বাজি তুবড়ি দেখতে যেমন, যাত্রাটাত্রা শুনতেও তেমন নিজগ্রামের লোক সবাই যায়। ছাত্ররা তাদের পিতামাতার সঙ্গে, চাপল্যবশে নিজেরা একাও নিশ্চয় যায়।

—তা হলেই দেখুন, সার। উপরন্তু যদি তারা দেখে তাদেরই একজন শিক্ষক সেই অভিনয়ে অংশ নিচ্ছে?

—সে কি! কে?

—আমাদের চরণ দাস।

বাগচী হো হো করে হেসে উঠলো। চরণ দাসকে অভিনয় করতে দেখার কল্পনায়। পথের ধারে সে দাঁড়িয়ে পড়লো। হাসি থামলে বললো,—বলেন কি? আমাদের চরণ দাস?

সর্বরঞ্জনপ্রসাদ নিওগি বললো,—নাটক মাত্রেই নারীচরিত্র থাকে। থাকে না কি? এবং তাদের হাবভাব লীলাকলা কখনই ভালো বিষয় নয়।

বাগচী হাসিমুখে বললো,—নারীচরিত্রও নাকি?

—সেই নারী চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কোন চরিত্র অভিনয় করা কি ভালো?

বাগচীর গায়ে সকালের রোদ পড়ছে। অদূরের একটা গাছের ডালপালার ছায়া তার পায়ের কাছে। সে বললো,—এই এক মহাঅনিষ্ট। আজন্ম আমরা নানা নারীচরিত্রের সঙ্গে জড়িত। ওতপ্রোতভাবেই। এমন কি আমরা সুরু হচ্ছি নারীর উদর থেকে।

নিওগি তার বক্তব্যকে বাছাই করে নিলো। তার দাড়িটা কেঁপে উঠলো একবার। সে বললো,—না, না, না, একে আমরা বোধ হয় অত সহজে চিন্তা থেকে সরিয়ে দিতে পারি না। তাদের এই নাটকে পরনারীধর্ষণের চিত্র আছে, ইঙ্গিত আছে। জগদীশ্বর আমাদের পাপকথন ক্ষমা করুন।

নিওগি দুহাত তুলে দুটি তর্জনী অনেকটা করে নিজের কানে ঢুকিয়ে দিলো।

কারো কারো কৌতুকবোধ বেয়াড়া রকমের থাকে। মনে হ'লো বাগচী আবার হেসে উঠবে। কিন্তু সে থমকে গেলো এবং তারপরে চিন্তা করলো। সে অনুভব করলো নিওগির প্রকাশটা কৌতুকের হলেও এর মধ্যে কোথাও একটা চিন্তার বিষয় থেকে যাচ্ছে। নারীধর্ষণ অসম্ভব ঘটনা নয়। নাটকে তার চিত্র থাকা সম্ভব। বিশেষ একজন শিক্ষকের পক্ষে সেই নাটকে অংশ গ্রহণ করার মধ্যে উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে বৈ কি।

তার হাতের ছাতাটা একটু দুললো। সে বললো,—আচ্ছা, এ বিষয়ে আমি চিন্তা করবো। চরণের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা ভালো করে জেনে নিই।

সে চলতে সুরু করলো।.. একটু পরে বললো, আচ্ছা সর্বরঞ্জনবাবু, আপনার কি মনে হয় এ গ্রামটায় কি এক বিশেষত্ব আছে। আমার মনে হচ্ছে কথাটা বোধহয় এই যে আনন্দদায়ক শান্তি এখানে খুঁজলেই পাওয়া যাবে।

—ঈশ্বরের কৃপায় তা হতে পারে।

—নিশ্চয় নিশ্চয়, তিনি কৃপা না করলে কৃপা চাইবার বুদ্ধিও হয় না। আমাকে একটা ভালো সংবাদ দিতে পারি, আপনার মতও জানতে পারি। এ অঞ্চলে একটা ক্রিশ্চিয়ান মিশন হাউস হতে পারে এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

—এ তো আশ্চর্যের কথা, সার।

—হ্যাঁ, ব্যাপারটা যেন ঘটতে চলেছে। আপনি ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীদের কথা অবগত আছেন।

তাঁদের একজন, রেভারেণ্ড বলে, এ অঞ্চলে মিশন হাউস বসাতে চান। হয়তো একটা চিকিৎসালয়, একটা গির্জা, একটা স্কুলও হবে সেই সঙ্গে। নিওগি মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, না, না, সার, এর চাইতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নেই।

—ক্ষতি কি? বরং ভালো, তাই নয়? ধর্ম সম্বন্ধে যত আলোচনা হয় ততই ভালো।

—অবশ্যই, তা অবশ্যই। নিওগি ডাইনে বাঁয়ে মাথা দুলিয়ে নিজেকে সমর্থন করলো।

ধর্মচিন্তা মনে এলো বাগচীর। ধর্ম অর্থাৎ ঈশ্বর, ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার চেষ্টা, তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করার চেষ্টা। তার মুখটা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বলে রোমান ক্যাথলিক। তার চার্চে হয়তো বহু মূল্যবান শ্বেত পাথরের ম্যাডোনা মূর্তিও থাকতে পারবে। এ থেকেই হঠাৎ তার জানতে কৌতূহল হলো, নিওগি তো নতুন অর্থাৎ ব্রাহ্ম ধর্মমতের আশ্রয়ে আছে, ঈশ্বরকে চিন্তা করতে তার মনশ্চক্ষে কি প্রতিভাত হয়। তার নিজের ব্যাপারে ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে বলতে হলে বৃহস্পতিবারে প্রার্থনা করতে বলে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলো, তার মন যেন এক ঈশ্বরে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। পরে ভাবতে গিয়ে সে আবিষ্কার করেছিলো সেটা মিখায়েলেঞ্জোলোর সেই বিখ্যাত মোজেজ ভাস্কর্য। একথা কিন্তু কেউকেও বলা যায় নি।

নিওগিও ভাবছিলো সম্ভবত। কারণ এ সময়ে তার ঠোঁট দুটি ও চোয়াল কিছু চিবানোর ভঙ্গিতে নড়ছিলো। সে বললো,—চরণের এই পদধ্বলনের ব্যাপারটা কি আপনি মনে রাখবেন, সার? না, না, একথা আমাকে বলতেই হবে, ওটা তুচ্ছ ব্যাপার নয়। হয়তো অভিনয়ে নর্তকী যোগ দিচ্ছে না, কিন্তু বিষয়টা কি ভয়ঙ্কর ভাবে মারাত্মক। বিশেষ এ গ্রামে, এ গ্রামে সার, রুগ্ন দেহে কুপথ্য সম্বন্ধে যেমন, এসব বিষয়ে সতর্ক থাকতেই হবে।

বাগচী বললো,—কি বলছিলেন? ও হ্যাঁ, মনে রাখবো। কিন্তু এ গ্রাম সম্বন্ধে কি রোগের কথা বলছিলেন?

নিওগি বললো,—সত্যভাষণের সুযোগ সত্যই কম, সুযোগ দেখা দিলে সত্যভাষণই কর্তব্য। আপনি যখন রেভারেণ্ড বলের মিশন হাউস কল্পনা করে আনন্দিত, তখনই দেখুন এই গ্রামে কত না জাঁকজমক সহকারে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

—রানীমার শিবমন্দিরের কথা বলছেন? তা একটু জাঁকজমক কেন, বিশেষ জাঁকজমকই তো হওয়ার কথা। ওঁরা ধনবান।

—কিন্তু, নিওগি গম্ভীর মুখে বললো,—এও কি ভালো সেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় রক্তচন্দন ব্যবহৃত হবে?

বাগচী হো হো করে হেসে উঠলো, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বললো,—আমার লঘুতা ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন আমার পূর্বপুরুষরা ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, শিবপূজায় রক্তচন্দন প্রয়োজনের কিংবা অনর্থ—তা আমার একদম জানা নেই। আপনার কি মনে হয় শ্বেতচন্দনই প্রশস্ত ছিলো?

নিওগি বললো,—না, না, এসব ব্যাপার লঘুভাবে দেখা উচিত হয় না সম্ভবত। রক্তচন্দন কি রক্তের প্রতীক নয়। তা কি সেই লিঙ্গ উপাসনাকে আরও বেশী বাস্তব করছে না? তিনি অন্নদাত্রী, সুতরাং হয়তো আমার আলোচনা করা উচিত হচ্ছে না, কিন্তু একবারও যদি না বলি সত্যই কি

কুণ্ঠিত হয় না? এ আমাকে বলতেই হবে। তা হয়তো রক্তচন্দনও নয়। যে প্রকার শুনি তা রানীমার বুকের রক্তই বা।

বাগচী গম্ভীর হলো। বিশেষ গম্ভীর দেখালো তাকে। তারপরে সে হাসলো নিঃশব্দে। বললো,—আচ্ছা, নিওগি মশাই, নমস্কার। আপনি অনেকদূর এসেছেন। স্নান আহার করে স্কুলে আসতে দেরি হয়ে যাবে যদি এখনই না ফেরেন। আপনি নিশ্চয় পাংচুয়ালিটি পছন্দ করেন।

কোথাও কি কিছু কাঠিন্য প্রকাশ পেলো? বাগচীর হাসিটায় সরসতা কিছু বইলো না।

সর্বরঞ্জনপ্রসাদকুসুম দাঁড়ালো। বললো, নমস্কার, সার, নমস্কার। আজকের প্রভাতটা কি সুন্দরই কাটলো—শান্ত মধুর সমীরণের এই প্রভাত। ঈশ্বর, তোমারই করুণাময় বিধান।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের মধ্যে ধর্মমত নিয়ে, সুনীতি দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছিলো। এখন যেমন তখনও তেমনি সাধারণত মনে করা হতো কলকাতার চালচলন আদবকায়দাই সংস্কৃতি। এবং তখনও, এখনকার মতো, আঁতাগার্দ তারাই ছিলো যারা একেবারে কলকাতার একেবারে হালফিলের ঝোঁক অনুসারে চলতে শিখতো। পৌত্তলিকতা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে তো আর গোলমাল ছিলোই না। কালেজশিক্ষিত যুবক মাত্রেই যেন পৌত্তলিকতার সীমাহীন সেকেলে কুসংস্কার ত্যাগ করতে না-পারাকে মনঃরোগ মনে করতো। এমন কি নতুন যে ব্রাহ্মধর্ম, সেখানেও কোন্‌টা আঁতাগার্দ হবে এমন তর্ক দেখা দিচ্ছিলো। উপাসনা পরিচালনার বেদিতে ব্রাহ্মণ কিংবা অব্রাহ্মণ বসতে পারে, এ নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ বিখণ্ডিত হবে কিংবা হচ্ছে। নববিধান ও আদি ব্রাহ্মসমাজ কোন্‌টি সত্যধর্ম তার সূচনা হচ্ছে কিংবা হবে। সুতরাং ধর্ম একটা অতিশয় উত্তেজক চিন্তার কারণ হয়ে উঠছিলো। অন্যদিকে তখন এদেশের ভাষায় নাটক লেখা হচ্ছে। জনসাধারণ তারাও কলকেতার আর এক আঁতাগার্দ শ্রেণী সেদিকে উত্তেজক কিছু পাবে মনে হচ্ছে এবং আঁতাগার্দের লক্ষণ হবে নাটকপ্রিয়তা, এমন ঝোঁক দেখা দিচ্ছে। কিন্তু প্রাগ্রসর দলেও অধিকতর প্রাগ্রসর কেউ কেউ থাকে। নাটক সম্বন্ধেই একাংশের মনে তখন বিতৃষ্ণা দেখা দিচ্ছে, কেন না নাটক অলীক এবং নারী-সংযুক্ত বিষয়, অভিনেত্রীরা কি নরকের দ্বারস্বরূপ নয় এবং অলীক ভাবনা কি মানুষকে সত্যধর্মচিন্তা থেকে বিচ্যুত করে না? এই চিন্তাও তখন আধুনিকতম আঁতাগার্দের লক্ষণ হচ্ছে / হবে, এমন সুযোগ দেখা দিয়েছে।

কিন্তু জীবন এমন সাজানো ব্যাপার নয় যে সর্বরঞ্জনপ্রসাদকুসুম নিওগি সেদিন স্কুলের টিফিন পিরিআডে আলোচনা করার সুযোগটা পেয়ে যাবে। শনিবার পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। যদিও এই আলোচনাটা অনেক দিক দিয়ে তৎকালের আধুনিকত্ব ছিলো।

এখন নিওগির চিন্তাটা ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হলো। না, না, সে আজ প্রত্যুষে একটা রীতিমতো ভালো কাজ করেছে সন্দেহ নেই। কথাগুলো ডায়েরিতে লিখে রাখবার মতো নয়? ব্যাপকভাবে দেখতে পেলে সে যা করেছে তা স্বদেশের উন্নতির প্রয়াস এবং সুনীতিরক্ষার আর একটা প্রচেষ্টা। তার মুখের মধ্যে কিছুই তিক্ত বোধ হচ্ছে না। সেখানে বরং কফির সুস্বাদ। তার মাথাটা এতটুকুও ভার বোধ হচ্ছে না। বরং সকালের এই রৌদ্র যা শীতের বলে এত মধুর তা যেন তার রক্তধারাকে ক্রমশ আনন্দিত করছে। না, না, এটা ডায়েরিতে লিখে রাখার মতো ব্যাপারই বটে।

এবং ঈশ্বর তাঁর করুণাময় বিধানে যেখানে যাকে স্থাপিত করেছেন সেখানেই তাকে সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস করে যেতে হবে। এবং এই গ্রামে এই নীতি প্রয়োগ করার যথেষ্ট সুযোগ উপস্থিত, কেননা যেখানে অন্ধকার সেখানেই তো আলোকপ্রকাশের সুযোগ।

সে একাও নয়। উপনিষদে লেখে একাহং বহুস্যাম। আমি এক কিন্তু বহু হইব। মানুষও সেইভাবে অগ্রসর হতে পারে। নরেশ ও সুরেন দুজনেই যে সত্যধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। নরেশ কলকাতায় থাকাকালীনই দু-একটি উপাসনায় যোগ দিয়েছে। সুরেনও স্বীকার করে, ঈশ্বর অবশ্যই পুতুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে পারে না। আর চরণ সে বিধবা বিবাহ করার হেতু এই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। মানুষমাত্রেই সমাজ খোঁজে। সুতরাং যদি নতুন এক সমাজে আশ্রয়ের আশ্বাস পায়, অবশ্যই চরণ সেই সমাজকে সাগ্রহে অবলম্বন করবে।

কিন্তু সর্বরঞ্জনপ্রসাদ বুঝতে পারে নি তার চিন্তাটা নতুন পথে না গিয়ে বরং পুরনো পথেই ঘুরে আসছে। হঠাৎ বুঝতে পেরে সে যেন থেমে দাঁড়ালো। হ্যাঁ, এটাই তো তার দুর্ভাবনার মূলে যে এই তিনজনই অর্থাৎ সুরেন, নরেশ এবং চরণদাস তিনজনই থিয়েটারের ব্যাপারে নিতান্ত আসক্ত।

সে বিষয়টাকে নিজের মনের মধ্যে যেন ওজন করে দেখতে লাগলো। এখন হয়তো এই থিয়েটার বন্ধ করার উপায় সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। খুব দেরি হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে রাজবাড়ির উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়ে থাকে যদি তবে বাধা দিতে গিয়ে রাজবাড়ির অপ্রসন্নতা আকর্ষণ করা হবে।

সুতরাং—হঠাৎ সে যেন আলোক দেখতে পেলো—রোগের উৎপত্তির পর যেমন ঔষধ তেমন এই থিয়েটার রোগেরও ঔষধ হিসাবে আর একটি উৎসব করা যেতে পারে।

না, না, এটা আদৌ অসম্ভব নয়। বরং অতিশ্রুই বন্দোবস্ত করা যায়। তার কনিষ্ঠ সন্তানের নামকরণ উৎসব এখনও হয় নাই। সেটাকেই যথোপযুক্তভাবে পালন করা যায় না কি? নরেশ, সুরেন এবং চরণদাসকে অবশ্যই আমন্ত্রণ করা হবে; এবং নিশ্চয়ই দেওয়ানজি হবেন সেই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ। নরেশ, সুরেন, চরণদাস দেওয়ানজিকে সমাজের আবহাওয়ায়, প্রার্থনা-সভার পরিমণ্ডলে পেলে অবশ্যই বুঝতে পারবে সমাজটি নিতান্ত হীনবল নয়। কলকাতার মানুষ নরেশ এবং সুরেন বরং অনুভব করবে এখানে অতঃপর স্ত্রীপুত্রাদি নিয়ে বাস করা যায়।

আশাবাদী মানুষ সহজেই উৎফুল্ল হয়ে থাকে। সর্বরঞ্জনপ্রসাদ নিওগি স্বদেশের উন্নতি ও সুনীতি রক্ষার গুরু দায়িত্ব নিজের কাঁধে বহন করা সত্ত্বেও দ্রুত দৃঢ় পদক্ষেপে চলতে লাগলো। তাকে বিশেষ প্রফুল্লও দেখালো।

এবং সেই প্রার্থনাসভায়, (ইতিমধ্যে লতাপাতায় সাজানো, দেয়ালে লাল সালুতে তুলোর অক্ষরে ব্রহ্ম সত্য হরেনামৈব কেবলম প্রভৃতি পতাকায় সাজানো উৎসবগৃহের ছবি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে) দেওয়ানজি নিশ্চিত বেদিতে বসবেন এবং প্রার্থনা পরিচালনা করবেন। না, না, এটা করতেই হবে। যদিও সে নিজে ব্রাহ্মণ এবং দেওয়ানজি কায়স্থবংশের এখানে এই সমাজে গোড়া থেকেই ব্রাহ্মণের উপাসনা পরিচালনা করার বিশেষ অধিকারকে অস্বীকার করতে হবে। কলকাতায় আমাদের ধর্মসমাজে যা নিয়ে চাপা অসন্তোষ তা এখানে গোড়া থেকেই দূরে রাখতে হবে।

নিওগি এদিকে ওদিকে চাইলো। তার দরকার ছিলো না, কারণ এগুলি তো চিন্তা মাত্র, উচ্চারিত শব্দ নয় যে কেউ শুনে ফেলবে। কলকাতায় গুজব এই দেবেন ঠাকুর মশায় ব্রাহ্মণদের এই বিশেষ অধিকারের পক্ষপাতী এবং কেশব সেন মশায় বরং উদার। (এ বিষয়ে নিওগির একজন আত্মীয় বলেছে)—কারণ কেশব সেনের স্বশ্রেণীস্বার্থ এই উদারতায় রক্ষিত হবে। (এবং নিওগির নিজের মুরুব্বী মেট্রোপলিটনের অধ্যাপক ভাদুড়ী মশায়, যিনি দেওয়ানজির বন্ধুও, আবার বলেছেন), —দেবেন ঠাকুর মশায়ের মত মূল সমাজের কাঠামোকে কিছুটা মানছে বলে বেশী বাধা পাবে না, কেশব সেন প্রমুখের মত বৈপ্লবিক বলে বাধা পাবে। ফলে ধর্মচিন্তার চাইতে বাধাজয়ের দিকেই নজর দিতে হবে বেশী। সে যাই হোক, এখন ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে তিন টুকরো না হয়।

নিওগি ভাবলো: ভাদুড়ী মশায়কে সে শ্রদ্ধা করে, ভাদুড়ী মশায়ের কাছে সে কৃতজ্ঞ, কিন্তু বোধ হয় এই এক বিষয়ে সে ভাদুড়ী মশায়ের চাইতে বেশী দেখতে পায় যে প্রবীণ দেবেন ঠাকুর মশায় ব্রাহ্মসমাজকে ভাঙতে দেবেন না। এবং শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনায় প্রার্থনাবেদিতে অব্রাহ্মণের অধিকার মেনে নেবেন।

না, না, এই উপাসনার বন্দোবস্ত করতেই হবে। এবং সেই প্রার্থনাসভায় দেওয়ানজিই অবশ্য প্রার্থনা পরিচালনা করবেন। এবং পরবর্তী কালে এই অঞ্চলের আধুনিক জাগরণের বিষয় যখন লিখিত হবে দেওয়ানজির সেই প্রার্থনাকেই সূচনা বলে চিহ্নিত করা হবে তাতে সন্দেহ কি।

নিওগি দ্রুত পথ চলছিলো। চিন্তার আবেগে কারো কারো গতিতে বলসঞ্চার হয়। নিওগি তেমন একজন। পথ ঘাটে এখনও লোকচলাচল কম। ভিড় থাকলে তারা নিওগির এই দ্রুত গতিকে বিশেষ দ্রষ্টব্য মনে করতো।

বাগচী স্কুলের দিকে অগ্রসর হলো। সকালের পরিচ্ছন্ন আলো যা বরং উষ্ণতায় সুখদায়ক তাতে মনকে প্রফুল্ল করার কিছু ছিলো। বাগচীর মন ধর্মচিন্তায় ফিরে গেলো। সে ভাবলো এটা একটা নিছক যোগাযোগের ব্যাপার নয় যে ঈশ্বরচিন্তার ব্যাপারে নর-নারীর সংযুক্তজীবনের চিন্তা কোথায় যেন যুক্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নর-নারীর সংযুক্তজীবনকেই ঈশ্বরচিন্তার পক্ষে অপবিত্র মনে করা হয়। এই যে রলে চিঠি লিখেছে, সে রোম্যান ক্যাথলিক প্রচারক হিসাবে অবশ্যই অকৃতদার। তার মিশন হাউসে সন্ন্যাসিনীরা আসতে পারেন। তাঁরাও অবিবাহিতাই হবেন। এদিকে কি বৌদ্ধভ্রমণ কি হিন্দু সন্ন্যাসী, নারীসংযুক্ত জীবনকে পরিহার করেন। কোথায় ইউরোপ, কোথায় ভারত—এ বিষয়ে একই সিদ্ধান্ত করেছে। এমন কি যারা সন্ন্যাসী নয় গৃহী, তারাও নারী সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তান্বিত। এই যে নিওগি নাটক সম্বন্ধে তার তীব্র আপত্তি প্রকাশ করলো, তা তো অপবিত্র নারীসংযোগের আতঙ্কই। লোভ, ক্রোধ, ঈর্ষা ইত্যাদিকে এমন আতঙ্কের দৃষ্টিতে দেখা হয় না কেন?

নতুবা বলতে হয় নিওগি হয়তো ভাবেন নাটক সঙ্গীত ইত্যাদি মানুষের মনকে হালকা করে বলে তা সবই ঈশ্বরচিন্তার পরিপন্থী। বাগচী ভাবলো—এরকম কথা যেন কোথায় সেদিন শুনেছি? আলমগীর বাদশার সেই সঙ্গীতকে কবর দেয়ার গল্প? না। সেদিন কীবল বলছিলো বটে ভল্ল. জি. ওয়ার্ডের গল্প। গল্পটা মনে পড়ায় বাগচীর মুখে হাসি হাসি ভাব দেখা দিলো। ডক্টর পুসে ক্যাথলিক বটেন, কিন্তু এ বিষয়ে শক্ত মত তাঁর।

নিওগির ধরনধারন বরং প্রটেস্ট্যান্টদের মতো কিংবা পিউরিটান বলা ভালো। মিতব্যয়ী, হিসেবি, সুবয়নচেতন, বয়সের পক্ষে বেশী গম্ভীর; নিজের চরিত্র সংশোধন করার জন্য ডায়েরি রাখে।

নিওগিদের এই নতুন ধর্মের আন্দোলনটায় রোমান ক্যাথলিক থেকে প্রটেস্ট্যান্ট মতে পৌছানোর মতো কিছু আছে। মেরির মূর্তি থেকে ক্রশের প্রতীকে, লাটিন থেকে মাতৃভাষায়, তেমন এরাও সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় যাচ্ছে।

এরকম একটা মত আছে, প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমত প্রসারের সঙ্গে পোপের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা অনেকখানি জড়িত ছিলো। সংস্কৃতিকে ভ্যাটিকান-কেন্দ্রিক না রেখে স্বদেশ-ভিত্তিক করার চেষ্টা ছিলো। এখানে কিন্তু নিওগিদের ধর্মমতের সঙ্গে প্রটেস্ট্যান্টদের ধর্মমতের উত্থানের কারণে মিল থাকছে না। এখানে কোন্ মূর্তিবাদীর রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্তি? এখানে বরং সংস্কৃতিকে লণ্ডন-কেন্দ্রিক করে তোলা হচ্ছে যেন। বাগচী কিছুক্ষণের জন্য এই ব্যাপারে গম্ভীর চিন্তা করার কিছু পেলো যেন।

কিন্তু কৌতুকের কথা মেরি এবং যিশাস রূপে যখন ঈশ্বরকে অন্তরে ধারণ করা হচ্ছে না তখন কিরূপে তা ধ্যান করা হচ্ছে। বাগচীর মুখে হাসির ভাব খেলা করলো। তার অর্ধস্ফুট চিন্তায় আবার মিকালেঞ্জেলোর মোজেজের মূর্তিটা দেখা দিলো। সে ভাবলো সত্যিকারের ধার্মিক প্রটেস্ট্যান্ট কাউকে পেলে জিজ্ঞাসা করতে হবে গভীর ঐকান্তিকতায় প্রার্থনা করার সময়ে ঈশ্বর তার অন্তরে কি ভাবে আভাসিত হন। তা কি এক আলোকপ্রসারী ইবনি অথবা অতি উজ্জ্বল রূপা কিংবা সোনার ক্রশ।

বাগচী সুতরাং অন্যমনস্ক ছিলো যখন সে স্কুলের দরজার কাছে ছাত্রদের একটা ছোটখাট ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পৌছলো। তাদের মধ্যে দিয়ে দু-এক পা এগিয়ে গিয়ে তবে তার মনে হলো এ সময়ে এমনভাবে তো তাদের আসার কথা নয়। সে বললো, কি ব্যাপার? কে একজন বললো—ইসমাইলের চোখটা, সার।

বাগচী নিজেই ওদের সমস্যা কিংবা কৌতূহলের বিষয়টাকে যেন দেখতে পেলো। ছাত্রদের একজনের চোখ কপাল জড়িয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কে একজন আবার বললো, ওকে ওষুধ দেন, সার।

পরে এই বিষয়টাকে বাগচীকে মনে আনতে হয়েছিলো। এবং ভাবতে গিয়ে মনে হয়েছিলো ছাত্ররা অদ্ভুত রকমে অনুত্তেজিত ছিলো। হেডমাস্টারকে দেখে এরা সুশৃঙ্খল এবং সুনিয়ন্ত্রিত থাকবে, এটা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য।

বাগচী মুহূর্তে ছাতাটা একজনকে ধরতে দিলো, কোট খুলে সেটাও আর একজনকে ধরিয়ে দিয়ে ব্যাণ্ডেজ খুলতে সুরু করলো।

অসুখটা কঠিন। চোখটা বিশ্রী রকমে ফুলে বন্ধ হয়ে আছে। যে তুলো দেয়া হয়েছিলো সেটায় কিছু রক্তের চিহ্ন। অন্য চোখটিও আক্রান্ত কিন্তু ততটা ফোলা নয়। আবার সস্নেহে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলো বাগচী। বললো,—একজন আমার সঙ্গে স্কুলের ভিতরে আয়। হাত ধুয়ে আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি। আমার বাংলোয় গিয়ে দিবি।

বাগচী স্কুলে ঢুকে নিজের বসবার ঘরে গিয়ে হাত ধুয়ে ওষুধ লিখে ছাত্রটিকে দিয়ে কোট পরে

আবার রোগীকে উপদেশ দেয়ার জন্য স্কুলের দরজায় এলো।

ছাত্রদের একজন বললো,—আমাদের ইসমাইলের চোখটা সারবে তো সার?

বাগচী বললো,—তোমাদের ইসমাইল? আমাদের বুঝি কেউ নয়? তুমি কিন্তু টক্ খেয়ো না, ইসমাইল। ভয় পেয়ো না। বিকেলে চরণদাসের বাড়িতে যেয়ো। আমি তাকে বলে দেবো। আবার ওষুধ খাবে।

ছাত্ররা চলে গেলো। বাগচী একটু দাঁড়ালো। স্কুলের দরজার পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছ। তার ডালপালার ফাঁকে রোদ এসে পড়লো বাগচীর গায়ে। ঘড়ি বার করে সময় দেখলো বাগচী। আটটা বাজতে এখনও কিছু দেরি। তার অর্থ এই হয় অন্যান্য দিনের চাইতে এখনও সে প্রায় আধ ঘণ্টা এগিয়ে আছে। এখন সে স্কুলের কাজ সুরু করার আগে, বলের চিঠিটার প্রাপ্তি-স্বীকার করতে পারে।

বাগচী যখন এরকম ভাবছে ঠিক তখনই সে পথ দিয়ে চরণদাসকে আসতে দেখতে পেলো। চরণদাসও স্কুলে আসবে। তবে সে দশটায়। তার আগে সে ডাকের কাজ করবে। কি অদ্ভুত খাটে লোকটি। আটটা থেকে দশটা ডাকের কাজ করে স্কুলে। টিফিন পিরিআডের পরেও এক ঘণ্টা স্কুলে কাজ করে, আবার ডাকে কাজ। বিকেলের পর ডিসপেনসারিতে গিয়ে ওষুধ দেয়। এরই মধ্যে আবার নিজের খেতখামারের কাজ করে। এদিকে নিওগি এই গ্রামে আসায় আর একটা কাজ যোগাড় করে নিয়েছে—বোধ হয় সপ্তাহে দু-তিনদিন ইংরেজি বাইবেল পড়ে নিওগির কাছে। ইংরেজি শেখার কৌশলই হয়তো।

চরণদাস স্কুলের দরজার কাছে এলে বাগচীও রাস্তায় এলো। বললো,—চলো, চরণ, তুমি ডাকের থলে পাঠাবে তো। আমিও একটা কার্ড দিয়ে আসি।

চরণের পাশে পাশে চলতে চলতে বাগচী বললো,—এই পথেই তো এসে ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়েছে? বিশ্রী রকমের কনজাংক্টিভাইটিস্ মনে হলো।

চরণ বললো বিরস মুখে,—দেখেছি, সার।

—একবার মনে হলো ব্যাণ্ডেজটা তোমার হাতের।

—তাই, সার। গরম জলের সেঁক দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলাম।

—ভালো করেছো। বিকেলে ডিসপেনসারিতে যাবে। মার্কসলই আবার দিও। আচ্ছা চরণ, তোমার সেই রসিকতাটা মনে আছে? ওই যে তুমি আত্মা মানে খৃষ্টানদের আত্মার লাখ বছর ঘুমিয়ে থাকার কথা বলেছিলে?

—ওটা, সার, গ্রাম্য রসিকতা হয়েছিলো।

বাগচী লক্ষ্য করলো চরণদাস যেন কিছু ভাবছে। আর তা নিতান্ত বিরস কিছু।

বাগচী কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললো,—দেখো চরণ, লোকে বলে আত্মা কৃতকর্মের জন্য অপেক্ষা করে থাকে, অন্যলোকে বলে আত্মার বিচার তখনই সুরু হয়ে যায়; এরকম মত আছে সমাজের সুবিধার জন্য মানুষের মনে শাসনের ভয় জাগিয়ে রাখার জন্যই আত্মা প্রভৃতি কল্পনা করা হয়েছে; অন্য কেউ বলে ঘটের মধ্যে যে আকাশ ঘট ভাঙলেই তা মহাকাশে মিলিয়ে যায়। আসল কথা, তুমি

দেখবে যারা আজ্ঞা লাখ বছর বিচারের অপেক্ষায় থাকবে মনে করে তাদের মধ্যেও প্রকৃত ধর্মপরায়ণ মানুষ থাকতে পারে।

হঠাৎ যেন মনোযোগী হলো চরণদাস। বললো,—কিছু বললেন, সার!

বাগচী অবাক হলো কিন্তু হেসে বললো,—আ, চরণ, আমার দার্শনিক বক্তৃতাটা মার গেলো। আচ্ছা চরণ, তুমি কি মিশন হাউস দেখেছো? আমাদের এই অঞ্চলে, মনে করো ফরাসডাঙায়, একটা মিশন হাউস হচ্ছে। এবং সেখানে একজন ইংরেজ পাদরি থাকছেন।

—সরেলগঞ্জে এক বাংলো আছে যেখানে সপরিবারে একাধিক ইংরেজ থাকছেন, সার।

—ও তা হলে তুমি ইংরেজ মিশনারীদের দেখোনি। শিক্ষাদীক্ষা, আধুনিকতা, বদান্যতা অনেক কিছু এই সব মিশনের সঙ্গে জড়িত থাকে। এ অঞ্চলে একটা মিশন হাউস হলে আমাদের গ্রামেও পরিবর্তন আসবে। তুমি শুনলে অবাক হবে ডানকান হোয়াইট নিজেই এ বিষয়ে উৎসাহী।

—দা ডেভিল ওআজ সিক্ দা ডেভিল এ সেন্ট উড বি।

—কি বললে? ডেভিল? আ, চরণ, তুমি কি কিছু ভালো দেখতে পাও না? তুমি কি বলবে এই মিশন হাউসের পিছনে ডানকানের শয়তানি আছে? ইংরেজি তুমি ভালোই শিখেছো। কিন্তু—

—হয়তো আমার ভুল, সার; আমাকে ক্ষমা করুন কিন্তু মিশন হাউসটা যদি হয়ই আমরা কি উপকৃত হবো?

—না, চরণ, তোমার উচ্চারণও ভালো। আমি মনে করতে পারছি না ডেভিল নিয়ে ওই ছড়াটা কোথায় আছে। নতুন কিছু পুরাতন কিছু আদর্শ সামনে আসার এই এক উপকার, প্রয়োজন মতো তা থেকে আমাদের পুরাতনকে বদলে নেয়া যায়। তাতে ভালো হয়।

—ভালো হয়?

—দেখো, এদেশেই আগে স্ত্রীলোকদের পুড়িয়ে মারা হতো। আর তাও যদি না হতো সেই বিধবারা অন্তের উপগ্রহের লক্ষ্য কিংবা দয়ার পাত্র হতেন। এখন তাঁরা বিবাহিত হচ্ছেন। নতুন জীবন পাচ্ছেন না? কুসংস্কার কেটে যাচ্ছে। এটা ইংরেজরা করেছে এমন বলা যায় না, কিন্তু এটা তাদের সামাজিক আদর্শ দেখে আমাদের সামাজিক আদর্শকে শুধরে নেয়া বলা চলে। অন্য দিকে দেখো রেলের গাড়ি হচ্ছে, তারের খবর চলেছে। হয়তো কিছুদিন পরে আমাদের গ্রামের কত ঘাটে বাষ্পের নৌকাও আসবে। তোমার স্কুলটাকে দেখো। সব কিছু ভুলে যাও যদি, আজ মোগল, কাল মারাঠা গ্রাম লুটে নিলো, খুনখারাবি, উপদ্রব, স্ত্রীলোকের উপরে উৎপীড়ন,—এসব নেই বললেই চলে।

চরণদাস উত্তর না দিয়ে পথ চলতে লাগলো।

বাগচী বললো,—এসব যদি কিছুই নয় মনে করো, তুমি একটা বিষয় লক্ষ্য করো। মিশন হাউসটা যদি হয় সেখানে একটা চিকিৎসালয় হতে পারে, একটা নতুন স্কুল, পরে একটা কলেজ। অন্য দিকে দেখো এই সবগুলিকে সংযুক্ত করে, এবং এই গ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করে কয়েকটি অন্তত পাকা সুরকিবাঁধানো রাস্তা তৈরি হবে।

চরণদাস বললো,—তাতে কি লাভ হয়?

বাগচী বললো,—যেন তা তার তর্কের টানেই, রানীর শিবমন্দির হচ্ছে। ওতে দেখো কত

লোক কাজ পেয়েছে। মিশন হাউস পথঘাট এসব তৈরি করতেও অনেক লোক কাজ পাবে।

—এটা যথার্থ, সার। চরণদাস অনুভব করছিলো তার কথাবার্তা একগুঁয়ের মতো শোনাচ্ছে। সে একমত হতে পেরে যেন স্বস্তি পেলো। বললো,—তা, ঠিকই সার, ডাকঘরের পরেই দেখুন কাঠি পুঁতে সড়ক বাড়ানোর কাজ সুরু হয়েছে। প্রতি শীতকালেই কিছু কিছু কাজ হয় এ ধরনের। এবার একটু বেশী হচ্ছে। নরেশবাবু বলছিলো নাকি শিবমন্দির তক্ পাকা রাস্তা হবে স্কুলবাড়ির পিছন দিয়ে রাজবাড়ির দরজা থেকে। সেই পথ নিয়ে যেতে পুরনো খিলের খাতের উপর দিয়ে অ্যাকোইডাক্ট তৈরি হবে।

—বলো কি? কই, আগে তো বলো নি?

—দু-চারদিন হলো নরেশবাবু রাস্তা জরিপ সুরু করেছেন। ফরাসডাঙার দিকে মিশন হাউসের কথা বলছিলেন, তা ওদিকে সার, আরও কাজ হচ্ছে। পিয়েত্রোর বাংলোর চালা বদলে, দরজা জানালার কাচ বদলে রং করে, দেয়ালে কলি ফিরিয়ে—এসব তো হচ্ছেই। ওদিকে একটা বড় বাড়িও হতে পারে। তা নাকি একটা সাহেববাড়ি মতো হতে পারে।

—তা হলেই দেখো। আচ্ছা, আচ্ছা, ওখানে ও বাড়িটা কেন হবে আন্দাজ করছো।

—নরেশবাবুর মতে, ওটা গেস্ট হাউস হতে পারে। তেমন সব সাহেব-সুবোর জন্য। এমনও হতে পারে রাজবাড়ির কেউ থাকবেন। রানী-মা হতে পারেন কিংবা নয়ন-ঠাকরুনও। তাঁর নিজের বাড়িটা খুব ছোট।

—রানীমা? রানীমা সেখানে থাকতে যাবেন কেন?

—সবই তো আন্দাজ, সার; ভিতরের কথা তো জানা যায় না। রাস্তা হচ্ছে শিবমন্দিরে যাওয়ার সুবিধার জন্য। বাড়িটা হবে হয়তো রাজকুমারের বিবাহের উপলক্ষে।

—বলো কি চরণ? বিয়ে রাজকুমারের? এমন আনন্দের সংবাদ?

বাগচীর মুখে যেন আনন্দের চিহ্ন। কিন্তু তখন সময়টা অন্য রকম। তারা চরণের ছোট্ট গ্রাম্য ডাকঘরের কাছে এসে পড়েছিলো। রলের চিঠির প্রাপ্তিস্বীকারের ভদ্রতা শেষ করে বাগচীকে ভুলে যেতে হবে। চরণকেও ডাকের থলে রওনা করে দিতে হবে।

বাগচী বললো,—আমি বারান্দায় দাঁড়াই। তুমি ভিতরে গিয়ে পোস্টকার্ড দিও।

দরজা খুলে ভিতরে যেতে যেতে চরণদাস চিন্তা করলো, তার কথাগুলো কি শ্লেষের মতো শুনিয়েছে? ঈশ্বর জানেন বাগচীর মতো একজন মানুষকে শ্লেষে কিছু বলার ঔদ্ধত্য তার নেই। এ বিষয়ে বাগচীর সঙ্গে একমত হতেই হবে, কিছু কিছু লোক কাজ পাচ্ছে বটে অর্থাৎ তাদের আর্থিক সুবিধা হচ্ছে।

অন্যদিকে, দিন তিনেক পরে বাগচী তার বাংলোর সম্মুখেই নিশানকাঠি পুঁতে রাস্তা জরিপ করতে দেখেছিলো নরেশকে। কিন্তু তা পরের কথা।

রোজকার মতো দুপুরে লাঞ্চে যাওয়ার পথে রলের চিঠিটাকে নিজেই ডাকে দিয়ে এলো বাগচী। পথে চলতে স্বভাবতই তার সকালের কথা মনে হলো। সে একবার ভাবলো শিবমন্দির পর্যন্ত

ফরাসডাঙ্গার দিকে রাস্তাটা পাকা করা হবে, সেখানে একটা নতুন প্রাসাদ হবে—এসব সে কিছুই জানতো না। সে ভাবলো—চরণ দু-একদিন হলো জেনেছে, এবং সেটা এজন্যই যে যারা এসব কাজ করে নরেশ এবং সুরেন তারা চরণদাসের সমবয়সী এবং হয়তো সেই নাটকের ব্যাপারেই রোজ একত্র হয়। পরক্ষণেই নিজের চিন্তাকেই মৃদু পরিহাস করে ভাবলো, দেখো কাণ্ড, রাজবাড়িতে কোন্ হুকুমে কখন কি কাজ হবে তা যেন তার জানার কথা? এবং তা যেন চিন্তার বিষয়ও হতে পারে।

কিন্তু লাঞ্চে বসে বাগচী বললো,—দেখো, ডার্লিং, এবারে আমাদের একটা ফিটনের কথা ভাবতে হয়।

—ফিটন? মানে ইংরেজিতেও যাকে ফিটন বলে?

—হাঁ। কালো কিংবা ডার্ক মেহগ্নি রঙের।

রসিকতাটা কোনদিকে যাচ্ছে তা বুঝতে না-পেরে কেট বললো,—বলো শুনছি।

—আমাদের এখানে তিন সালের বেশী হলো। আমার তো মনে হয় বাকি জীবনটা এখানেই কাটবে। এবং তা ভালোই কাটবে।

—বেশ তো, তার জন্য ফিটন কেন? নয়নতারার বাড়ি যেতে, না রাজবাড়ি যেতে তার ব্যবহার হবে?

—এই দেখো! রাজবাড়ির হাতা থেকে ফরাসডাঙ্গা অবধি সড়কটা হয়তো এই শীতেই বাঁধানো হবে। আর তা হবে রানীমার শিবমন্দির পর্যন্ত। দেখো আমরা পিছিয়ে আছি। খবরটা চরণদাস না বললে জানতেই পারতাম না।

কেট খিলখিল করে হাসলো,—কোন রাস্তায় সুরকি দিতে হবে এটা যে হেডমাস্টারের জানবার কথা তা আমার জানা ছিলো না। তুমি গ্রামকে খুব ভালবাসো তাতে সন্দেহ নেই। সেজন্যই তোমার এমন লাগছে। কিন্তু রাস্তার জন্য ফিটন না হয় হবে, কিন্তু গন্তব্য কি হলো?

—কেন তখন আর পাল্কী চেপে যেতে হবে না যেমন সেদিন গেলে। কিংবা গোরুগাড়ি করেও যেতে হবে না যেমন এর আগে গিয়েছিলে।

আবার তেমন করেই হাসলো কেট। বললো,—আবারও কি লাঞ্চ হবে নাকি পিয়েত্রোর বাংলোয়?

—আরে তা কেন? কাল তোমাকে মিশন হাউসের কথা বলছিলাম না?

—বলেছিলে বলে নামে একজন রোমান ক্যাথলিক মিশনারী এদিকে মিশন হাউস করা যায় কিনা জানতে চেয়েছে।

—সেই কথাই হলো। এদিকে মিশন হাউস হতে গেলে ফরাসডাঙ্গার চাইতে ভালো জায়গা আর কোথায়? তোমার কি মনে হয় না মিশন হাউস তৈরি হলে তুমি কখনও কখনও ফিটন ব্যবহার করবে?

কেট বাস্তববাদীর মতো বললো,—মিশন হাউসটায় লোকজন এলে তখন ফিটনের অর্ডার দিও।

এই বলে বাগচীর গল্পটাকে শেষ করে সে নিজের গল্প সুরু করলো,—আমাদের আণ্ডাওয়ালী কয়েকদিন আগে রাজবাড়িতে আণ্ডা বিক্রি করতে গিয়েছিলো।

—এই দেখো! তুমি কি বলবে রাজবাড়িতে আনাজ হিসাবে আণ্ডার প্রবর্তন শুরু হচ্ছে—এটা এক আধুনিকতা।

—আণ্ডাওয়ালী তার সুরমা-পরা চোখ যেমন করে পাকাচ্ছিলো, আর রেশমী চুড়ি পরা শুকনো হাত দুটো যেভাবে নাড়ছিলো মনে হবে ওটা একটা বড় ঘটনাই। শোন, আণ্ডা কিন্তু আমাদের রাজকুমারের জন্য নয়। সে নাকি অন্য এক রাজকুমার।

—আচ্ছা! গল্পটায় কৌতূহলের বিষয়ে বাগচী মন দিলো।

—একই রকম দেখতে। শুধু গায়ের রঙে তফাত। রানীমা আর নয়ন ঠাকরুনের রঙে যে তফাত সেই তফাত আমাদের রাজকুমার আর সে রাজকুমারে।

—রসো, রসো। বাগচী হাসতে হাসতে বললো,—রানীমাকে দেখেছো নাকি? তাঁর রং কি দুধে আলতায়? অর্থাৎ আমাদের রাজকুমার কিছুদিন রোদ বাঁচিয়ে চললে যে রকম দেখায়?

—ওঁরা পাশাপাশি না দাঁড়ালে ওসব সূক্ষ্ম তফাত ধরা যাবে না। কিন্তু শোন আণ্ডাওয়ালী যা বলছিলো। এই নতুন রাজকুমার নাকি ছ' আনির রাজকুমার। আর তিনি নাকি টেবলে বসে খান। বোম্বাই না দেরাদুন কোথায় সাহেবদের কাছে পড়েন।

—বোম্বাই আর দেরাদুন পাশাপাশি বটে! তা তোমার আণ্ডাওয়ালী রাজবাড়ির অনেক খবর এনেছে দেখো। এটা কিন্তু লক্ষ্য করার মতো এই নতুন আসা রাজকুমার টেবলে বসেন।

—শুধু কি তাই। এখানে এসেছিলেন রানীমার মত নিতে। এখানে থেকে বোম্বাই, বোম্বাই থেকে বিলেতে যাবেন। নাকি সেখান থেকে চীনে।

—কেন, জ্ঞানঠাকুরের মতো ব্যারিস্টার হতে?

—তা জানি না। এই নতুন রাজকুমারের কথা কিন্তু আমার কাছে একেবারে নতুন।

—সেটা আশ্চর্যের কি? রাজবাড়ির সব কথা সকলের জানার জন্য নয়।

বাগচীর ফিটনের কথা যা রলের মিশন হাউসের কল্পনার সঙ্গে জড়িত সেটা কিছু দূরে সরে গিয়েছিলো। লাঞ্চের শেষের দিকে কেটই বরং নতুন আর এক বিষয় উত্থাপন করলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাকে একেবারেই নতুন বলা উচিত হচ্ছে না। বাগচী সকালে যে সব বিষয় মনে এনেছিলো তার মধ্যে এটিও ছিলো। আবহাওয়া থেকে অনেক আলাপের বিষয় সৃষ্টি হতে পারে। মৃদুশীতটা কেটের মনে আনলো বিষয়টাকে। যেমন এনেছিলো বাগচীর চিন্তায়। সে বললো, গতবার কিন্তু আমরা ক্রিস্টমাসে কলকাতায় যেতে পারতাম।

—কেন? সে সময়ে দেওয়ানজির বজরা কলকেতায় গিয়েছিলো বলে।

—নিশ্চয়ই। তুমি কি মনে করো সাধারণত যে নৌকাগুলো দক্ষিণদিকে যাত্রা করে সেগুলো ভদ্রলোকের পক্ষে নিরাপদ?

—সব সময়ে নয়। তাছাড়া বিউটি প্রভোকেথ থিপ, সুনার ছান গোল্ড। (সৌন্দর্য সোনার চাইতেও চৌর্যকে লুব্ধ করে।)

কেট হেসে বললো,—দ্যাটস্ রক্বটম্ উইজডম্। (ওটা চূড়ান্ত বুদ্ধির কথা।) কিন্তু তা ছাড়াও ক্যালকাটার সমাজে সময় কাটানোর সঙ্গী খুঁজতে হতো না।

—বেশ কথা, তোমার মত জানা রইলো। গতবার রাজকুমারেরও যাওয়ার কথা ছিলো। এবার হয়তো যাবেন।

কিন্তু শুধু আবহাওয়াই তো নয়। আমাদের মনে চিন্তা অনেক সময়ে তির্যকভাবে আসে। বড়দিনে কলকাতায় যাওয়ার কথাটা গোড়ায় (একেবারে গোড়ায়) এমন একটা বিষয় ছিলো যাকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলে মনের চালচালনকে কৌতুকের মনে হবে। উল্টো দিক থেকে চিন্তার ব্যাপারটা এইরকম : বড়দিনে কলকাতায় যাওয়ার আগে রাজকুমারের কলকাতায় যাওয়া, বড়দিনের বা ইস্টারের উৎসবের সময়ে (যেমন রাজকুমার গতবার গিয়েছিলেন) ; তার আগে অন্য এক রাজকুমার বিলেতে যাচ্ছেন, রাজকুমারের কলকাতায় যাওয়ার মূলে কি উৎসবের আসরে ইংরেজ সমাজে মেশার সুযোগ আসে? সে সুযোগের কি দরকার? রাজকুমার একদিন বলেছিলেন বটে রসিকতার সুরে এর পরে তিনি মূর্খদের পর্যায়ে গণ্য হবেন। কিন্তু এই চিন্তাগুলোরও সূচনায় ছিলো আজ সকালের নিওগির শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা কথাগুলি।

—কেট ক্রিস্টমাসে কলকাতায় যাওয়ার চিন্তাটাকে পাশ কাটিয়ে রাজকুমারদের মতো মানুষদের কলকাতার বড়দিনের উৎসবে (অর্থাৎ খানাপিনায়) যোগ দিয়ে কী লাভ হয়, কী লাভ হতে পারে সে চিন্তা করবে যখন তখন তার মনে পড়লো এখন এটা লাঞ্চের ক্ষণস্থায়ী অবসর। এখন তেমন গুরুতর বিষয়ে আলাপ করা উচিত নয়। বরং রবিবারের সকালের জন্য এটা আলাপের বিষয় হতে পারে।

লাঞ্চ শেষে বাগচী পাইপ ধরানোর ব্যবস্থা করছে। পাইপটা শেষ হলে সে স্কুলে যাবে।

কেট হেসে বললো,—সেন্ট টমাস্ কিন্তু মনে মনে তোমার নতুন পরীক্ষাবিধিটাকে মানছেন না।

—আমারও ধারণা তাই। এ বিষয়ে আমি কিছু অনভিজ্ঞ। মনে হচ্ছে দেরি হয়ে যাবে।

—কি, জ্ঞানবিজ্ঞান শেখার বিষয়ে?

—তা তো বটেই। শিখতে হচ্ছে সবই ইংরেজি ভাষাকে আগে দখল করে। তাতে সময় চলে যাচ্ছে।

পাইপ সরিয়ে হাসলো চাগচী। বললো,—খারাপ! একজনের মুখের ইংরেছি না শুনলে, একজনের ঠোঁট দুটি কি করে ফুল হয়ে হয়ে শব্দগুলি তৈরি করছে না দেখলে আমার জগৎ অন্ধকার! —না ডার্লিং, স্বপ্নেও ইংরেজি আমার ভাষা।

—কথাটাকে এড়িয়ে গেলে।

—দেখো, আমি অসহিষ্ণু বলেই বোধ হয় এখন থেকেই প্রতিকার খুঁজছি। দেখো স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সব জায়গাতে ইংরেজি ভাষার উপরে জোর দেয়াতে শিক্ষিত বলতে ইংরেজিতে লিখতে বলতে পারে এমন লোককে বোঝাচ্ছে। কিছু দিনের মধ্যে একটা মাইনরিটি জন্মাবে যারা দেশের থেকে পৃথক হয়ে নিজেদের স্বার্থ মাত্রকে দেশের স্বার্থ মনে করবে।

বাগচী উঠলো ট্যাকঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে। পথে স্বাভাবিকভাবে স্কুলের কথাই মনে হলো বাগচীর। এই স্কুলটা কিন্তু একটা সাধারণ ব্যাপার নয়। কলকাতার সেই সব স্কুল যার সঙ্গে বীটন প্রভৃতিরা জড়িত তাদের মতোই একটা দৃঢ় বনিয়াদের বিশিষ্ট কিছু। আর মনে রাখতে হবে

দেওয়ানজি হরদয়ালের এটা হৃদয়ের সৃষ্টি। তাই বলতে হবে। একজন ঔপন্যাসিকের কাছে যেমন তার উপন্যাসগুলি, মনে করা যাক বলের কাছে যেমন তার মিশন হাউস হতে পারে, তেমন হরদয়ালের কাছে এই স্কুল। সেই প্রথম দিকে মনে হয়েছিলো চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে এটা এক আলোকস্তম্ভ যেন। তখন হরদয়ালের মনে স্কুলটাকে আবাসিক করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিলো। আশঙ্কা করেছিলেন স্কুলে যা শিখবে গৃহের কুসংস্কারের আবহাওয়ায় তা কি মূল্যহীন হয়ে যাবে না? এই কথাটাতে হরদয়ালের স্কুল স্থাপনের আগ্রহটা কোথায় তাও যেন কিছু বোঝা যায়।

আগ্রহ তো বটেই। নতুবা কে নিজের সঞ্চয় উজাড় করে দেন? বেতনের একটা অংশ নিয়মিত অনুদান হিসাবে বহাল রাখেন?

এই চিন্তাগুলো বাগচীকে একেবারে তাঁর আধুনিকতম চিন্তায় নিয়ে এলো। একই সঙ্গে দুটো হয় না। হয় একটা ভালো হস্টেল করতে হয়, অন্তত জনদশেক ছাত্রের মতো, নতুবা প্রেসটাকে করতে হয়। হস্টেল দরকার। কয়েকটি ছেলে নানা জায়গা থেকে দরখাস্ত করেছে। একজন তো লিখেছে স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য যদি খৃস্টান হতে হয় তাতেও সে রাজী। (বাগচী আবার মনে মনে না-হেসে পারলো না।) অন্যদিকে উপযুক্ত বই কোথায়? কিছু কিছু নিজেদেরই লিখে ছাপিয়ে নিতে হয় না? এবার একটা পছন্দ করার পালা। কোন্‌টা আগে দরকার তা ঠিক করতে হবে।

কিন্তু চরিত্রগঠন—যা নিশ্চয়ই হরদয়ালের উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে কি স্কুল সাহায্য করছে? যে ছেলেটি স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য খৃস্টান হতেও রাজী (বাগচী কথাটা মনে হলে না হেসে পারে না—ছেলেটা শুনেছে হেডমাস্টার খৃস্টান, সুতরাং খৃস্টান হলেই বিশেষ সুবিধা), কি তার উদ্দেশ্য।

এ বিষয়ে বা অনুরূপ বিষয়ে রবিবারের প্রশস্ত অবসরে বাগচী আলাপ করেছিলো কেটের সঙ্গে। কিন্তু তার আগে শনিবার ছিলো। আর সেই শনিবারে সর্বরঞ্জনপ্রসাদকুসুম নিওগির কথা বলতে হয়, যদিও স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে তার কথা আমাদের এই ইতিহাসের মূল ধারা থেকে কিছু দূরে অবস্থিত। কিন্তু এই এক অসুবিধা এখানে যে ইতিহাসের উপাদানগুলো অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, (না আছে কোন রাজকাহিনী, না আছে পাথরে বা তামার পাতে খোদা সালতামিরের সাক্ষ্য)। বরং মনে হয় ইতিহাস যাদের কথা তাদেরই কারো কারো এরকম চেষ্টা ছিলো যেন পদচিহ্নের স্বাতন্ত্র্যগুলি মুছে দিতে হবে। এই গুহা থেকে যে নিষ্ক্রান্ত হয় কিংবা এই গুহাতে যে প্রবেশ করে সে অন্যান্য প্রাণীগুলি থেকে কিছুমাত্র পৃথক নয়, এরকম প্রচার ছিলো।

শহীদ শব্দটা এবং যার অনুকরণে তার ব্যবহার সেই মার্টার শব্দটা, দুই-ই বিদেশাগত। এই দেশের ভৌগোলিক সীমায় সম্ভবত যে মনোভাব থেকে শহীদ বা মার্টার হওয়াকে মহান কিছু মনে করা হয় সেটা ছিলো না। দধীচি এক মহান উদ্দেশ্যে আত্মবিসর্জন করেছিলো, কিন্তু তাকে তখনও কেউ শহীদ বলেনি। কখনও কখনও মনে হয় এদেশের জলবায়ুতে এমন কিছু আছে যার ফলে শহীদ হওয়ার মতো নিআত্মবিশ্বাস হতে আমরা জানতেম না। এমন কি হতে পারে যে দেমেটিক জগতের উদর কার্পণ্য এবং ইউরোপের সূর্যহীন শৈত্য মৃত্যুর অন্ধকার ও বন্ধ্যাত্বকে জীবনের সমান্তরাল বলে প্রতিষ্ঠিত করে?

সে যাই হোক, যখনকার কথা বলছি তখন শহীদ কথাটা তত প্রচলিত ছিলো না, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষিত মহলে মার্টার শব্দটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে। স্বভাবতই শব্দটা সাহিত্যের ছাত্র সর্বরঞ্জনপ্রসাদ কুসুমের জানা ছিলো। উপরন্তু গত চার-পাঁচ দিনের আলাপে (যে আলাপের জন্য গ্রামের ডাকঘরে সন্ধ্যার কিছু আগে যে আড্ডা বসে সেখানে পর্যন্ত সে নিজেকে উপস্থিত করেছিলো) সে বুঝতে পেরেছে সুরেন এবং নরেশ কলকেতার সঙ্গে সংযোগ থাকায় নতুন ধর্মমত সম্বন্ধে আগ্রহী বটে, তাতে কিন্তু বিয়েটারে আগ্রহ কম নয়। চরণদাসও বলেছে বিয়েটারটা মিটে গেলে সে আবার বাইবেল পড়তে যাবে (সে স্বীকার করে এত সহজে এত ভালো ইংরেজি শেখার অন্য উপায় নেই), কিন্তু অভিনয়ে অংশ যদি নাও নেয় প্রম্‌ট্‌ করার ব্যাপারে সে বন্ধুদের সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত সে বুঝতে পেরেছে (প্রমাণও তো হাতের কাছেই, এক সপ্তাহের মধ্যেই মৌখিক পরীক্ষার আদর্শ প্রশ্ন হেডমাস্টার মশায়ের হাতে পৌঁছে দিতে হবে), এখানকার যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে তা হবে কলকেতার শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পৃথক। চারিদিকে যেন অন্ধকার ঘিরে আসার আভাস।

অন্য দিকে কাল বিকেলে তাকে অবাক করে অত্যন্ত সুদৃশ্য এক প্রস্থ আসবাব তার বাসায় পৌঁছনা হয়েছে। আসবাব সম্বন্ধে হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে কথা হয়েছিলো বটে। ইতিমধ্যে কি সে আলাপের ফল দেখা দিলো? অথবা এটা তা নাও হতে পারে। যারা আসবাব এনেছিলো তারাই বললো এগুলো দেওয়ানকুঠিতে বাড়তি হয়েছে। অর্থাৎ হাতে কিছু বাড়তি আসবাব হতেই দেওয়ানজি তা পাঠিয়ে দিয়েছেন স্কুলের একজন শিক্ষকের সুবিধার কথা মনে রেখে।

এরই ফলে সকালেই সর্বরঞ্জনপ্রসাদের মনে একই কালে বেশ কিছু হতাশা এবং অল্প পরিমাণে উৎসাহ দেখা দিয়েছে। এবং সে অনুভব করছে তার এই পঁয়ত্রিশ বছর বাড়তে বাড়তে এক সময়ে পঁয়ষট্টি হবে। তখনও তাকে হয়তো এই গ্রামেই এই অল্পপরিমাণ উৎসাহ এবং সমধিক হতাশা নিয়ে চলতে হবে। না, না, এটা অনিবার্যই, কেন না যারা বি. এ. পাশ করেই হাকিম হতে পারছে তাদের মতো সৌভাগ্যবান নয় সে; এমন কি বি. এ. পাশ করার পরই সিম্পদন স্যামসন্ অ্যাটর্নি কোম্পানিতে যে আর্টিকেলড্ ক্লার্ক হওয়ার কল্পনা হয়েছিলো তাও অবান্তর, কেন না ততদিনে তার সংসার কে চালায়? এই অবস্থায় ভাদুড়ি মশায় যখন এই চাকরি করে দিলেন তখন এটাকেই ঈশ্বরনির্দিষ্ট বলে মানতে হবে। যাত্রার সময়ে সমাজবৃন্দরা সকলেই উচ্চকণ্ঠে তাকে আশীর্বাদ করেছে। সকলেই এক বাক্যে বলেছে: ইহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত জান করবে। মনে করো তোমার বদলে যদি পৌত্তলিক কারো এই চাকরি হতো সে কি দেশের ওই অংশকে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে সহায়তা করতো না? আর এখন তোমার আলোক থেকে কত ছাত্রই না আলো জ্বালে?

এখন প্রদীপের স্বভাবই এই যে তা জ্বলের মতো স্নিগ্ধতায় সার্থক হতে পারে না। তার আলো যখন স্নিগ্ধ তখনও কোথাও যেন একটা দহনের জ্বালা থাকে।

সুতরাং নিওগির মনে কিছু দাহ ছিলো। আপাতত তা সুরেন নরেশ প্রভৃতির নাটকপ্রিয়তা, যার অন্তনাম তার চিন্তার পরাজয়, তাকে অবলম্বন করে তীব্র। এই অবস্থায় স্কুলের জন্য পথে বেরিয়ে তার যেন অসংলগ্নভাবে মনে হলো সেণ্ট বার্থলোমিউকে ওরা গায়ের চামড়া তুলে নিয়েছিলো, সেণ্ট ফ্র্যান্সিসকে ওরা পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলো। হে প্রভু, আমাকে দগ্ধ করো, দগ্ধ করো। স্বর্ণকারের

ন্যায় তুমি আমার খাদ-পান পুড়িয়ে ফেলো। কেন না চারিদিকের ঘনিয়ে আসা অন্ধকার, যার প্রতীক সুরেন-নরেশের উপরে রাখা আস্থার বিশ্বাসঘাতকতা, এবং স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের প্রধান শিক্ষার স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া—তার মধ্যে স্কুলের এই স্থায়ী চাকরি যার বেতন তুলনীয় ভাবে ভালো এবং কাল বিকেলের পাওয়া সুদৃশ্য দামী আসবাব—(নাকি চাইনীজ লেকারের কাজ) যা তার মনে মৃদু উৎসাহ সঞ্চার করে বর্তমান। নিওগি নিজের চিন্তাকে বিশ্লেষণ করলে দেখতো তার স্বর্ণ ও খাদের কাব্যে স্বর্ণের সঙ্গে আসবাবগুলির ঔজ্জ্বল্য এবং খাদের সঙ্গে নাটকের ব্যাপারে তার পরাজয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

বোধ হয় মনের এই বিশেষ ভঙ্গিতে চলতে গিয়ে সর্বরঞ্জনপ্রসাদ সেই শনিবারটাকে বিশিষ্ট করে তুলেছিলো যার কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি।

তার মুখমণ্ডলে প্রশান্ত শান্তি, চোখে নিজের পরিবেশকে লক্ষ্য করার স্থির দৃষ্টি, কিন্তু অন্তর আলোক বিকিরণ করার আগ্রহ, যাকে জ্বালার থেকে এককালে পৃথক করা যায় না।

সে চিন্তা করলো এটা এখন আর জায়গীরদারি নয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে স্থির। সুতরাং স্থায়ীভাব আছে। এখানে যা কিছু করবে তা স্থায়ী হতে পারে একশ বছরের জন্য। করা যাক একটা ব্রহ্মমন্দির স্থাপন করা গেলো যেখানে সত্যধর্মের উপাসনা হবে। সেটা স্থায়ী হবে আশা করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে এটা তার চিন্তাকুশল মনের পরবর্তী চিন্তার পটভূমি রচনার চেষ্টা যা স্থানকে প্রথমে নির্দিষ্ট করলো। সে ভাবলো, তা ছাড়া এখানে আমরা অতিবৃদ্ধও কেউ নই। (এটা পাত্র সম্বন্ধে বটে কিন্তু সত্যচিন্তা হলো না। যে হেতু তার স্কুলে কৈলাস পণ্ডিত ছিলো যাকে স্থবির বলা উচিত, শিরোমণি নিযুক্ত হয়েছে যার পলিতকেশ তাকে প্রৌঢ়ত্বের সীমার ওপারে স্থাপন করে, রাজবাড়িতে নায়েব মশায় আছেন যাঁকে পরিপক্ব বলতে হয়। সর্বরঞ্জন বরং যেন বাছাই করে নিচ্ছে তার চিন্তাভাবনা কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত একটা টিম হতে পারে এমন মানুষ কয়েকটিকে।) কি আশ্চর্য আমরা প্রকৃতপক্ষে হয় সবেমাত্র চল্লিশ পার হয়েছি কিংবা চল্লিশের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। দেওয়ানজি, হেডমাস্টার মশাই, রানীমা (নিওগির বোন ব্রহ্মঠাকুরানী যে নাকি ঘটকিনী হয়ে এসেছিলো তার হিসাবে) এঁরা সবাই সবেমাত্র চল্লিশ পার হয়েছেন। ওদিকে ডানকান সাহেবও তাই হবে। সে নিজে, সুরেন, নরেশ, চরণদাস, এবং গৌরী প্রভৃতি আরও অনেকে ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। এ হিসাবে বোধ হয় মিসেস বাগচী এবং তার নিজের স্ত্রীকে ধরতে হয়। কিংবা টিম শব্দটা এখানে ঠিক নয়, বরং তেমন একটা খেলুড়ে দল যাদের থেকে নিজের দলের ও বিপক্ষের খেলোয়াড়দের বাছাই করা যায়।

অর্থাৎ এক কথায় সকলেই কর্মঠ এবং তার ফলে এই গ্রাম দ্রুত অগ্রসর হতে পারে। সর্বরঞ্জন অবশ্যই গ্রামের অসংখ্য বৃদ্ধ এবং তরুণদের হিসাবে আনলো না। এবং সে যেমন ভেবে থাকে ঠিক এই সময়েই ঈশ্বরনির্দিষ্টভাবে এক যোগাযোগ ঘটে গেলো। যা নিজের চিন্তায় তন্ময় থাকায় সে দেখেও দেখলো না। তিনটি ঘোড়া তীরের ফলার মতো অগ্রসর হচ্ছে। পুরোবর্তীটির একটু পিছনে রাস্তার দুপাশে ধুলি। পুরোবর্তী ঘোড়ার সওয়ার নিতান্ত তরুণ, তার পোশাক ইউরোপীয়; রাইডিং কোট এবং ব্রিচেস, মাথায় বারান্দা-দেয়া টুপি। পিছনের সওয়ার দুজনের পোশাক কি সর্বরঞ্জনের

পূর্বপরিচিত মনে হলো না ? লাটসাহেবের সওয়ারদলকে সে কি কলকাতায় দেখেনি। সেই রকমই পোশাক, রঙে তফাত ; পাগড়ির যে অংশ পিঠের উপরে তার গাঢ়নীল রঙে রুপার জরির দাগ ; তাদের হাতে খাড়া করে রাখা বল্লম—রুপোর তৈরি মনে হয় দণ্ড, কিন্তু তাহলে ভার হতো, হয়তো পাকা বেত বা বাঁশ রুপোয় মোড়া। বল্লমের ফলার কিছু নিচে একটা করে ছোট সরু গেরুয়া রঙের রেশমী পতাকা। যৌবনের চিহ্ন যেন। কোথায় কার মনে ইচ্ছা হয়ে ছিলো, আজই পথে দেখা দিলো। নতুন রিশালার প্রথম দল।

কিন্তু সর্বরঞ্জন নিওগি ভাবলো : এই পরিস্থিতিতে সব দুঃখজনক নয়। মনে রাখতে হবে এই গ্রামের স্বল্প কয়েকজন কর্মঠ পুরুষ যারা প্রভাব বিস্তার করতে পারে তাদের মধ্যে সেও একজন, যদিও সে পরে এসেছে। এবং আমাকেও যা জানি, যা বুঝি তার সম্যক প্রচার করতে হবে।

এ বিষয়ে অবশ্যই দেওয়ানজি তার প্রধান সহায়। পুত্রের নামকরণ-উৎসবে দেওয়ানজি প্রার্থনা-গীতি দিতে বসলে গ্রামের সকলে এ বিষয়টা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারবে। উৎসবের অন্যান্য ব্যবস্থা গৃহিণী অনায়াসেই করতে পারবে। এবং তার পরিবারের সকলেই এ ব্যাপারে গৃহিণীকে নিশ্চয় সাহায্য করবে। কিন্তু সর্বাগ্রে দেওয়ানজির মত নেয়া দরকার।

[ক্রমশ]

স মা লো চ না

দুঃখে সুখে বাঁচা—নিখিলচন্দ্র সরকার। রবীন্দ্র লাইব্রেরী। কলিকাতা, ১২। মূল্য দশ টাকা।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে প্রেমেন্দ্র ও শৈলজানন্দ মধ্যবিত্ত জীবনের ধূলিধূসরতা নিয়ে উপন্যাস রচনা করলেন। তখন শরৎসাহিত্যের স্নিগ্ধ রসে আপ্লুত বিপুল পাঠককুলের অনেকের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। নরনারীর আসঙ্গকামনার অচরিতার্থতা তবে কি মানবজীবনের মুখ্যতম সমস্যা নয়?

আছে সবই, তবু মানুষ তৃপ্তি পায়নি। মহানগরের গলিঘুঁজিতে মধ্যবিত্ত তার [illegible] মধ্যবর্তিতার উপকথায় নির্মমভাবে পরিহসিত ; নিঃস্বতার সীমান্তে দাঁড়িয়ে সে আজ ধুঁকছে [illegible] পুরাতন অন্ধ বিশ্বাসকে ত্যাগ করছে না কিছুতেই। সাগরসঙ্গমে গিয়েও সে পান করছে [illegible] জল গণ্ডূষ ভ'রে। দেশবিদেশের 'মুক্তিকামী'দের লোভের লালায় গ্রামে-গঞ্জে খাদ্যবস্ত্র অ[illegible] যায় ; মহাযুদ্ধের ইতিহাস মানবনিগ্রহের কালো কালো অক্ষরে ভ'রে ওঠে।

মানুষকে খুঁজতে গিয়ে অচিরকালের মধ্যে যেখানে এসে লেখকেরা দাঁড়ালেন, সেখানে মানুষ আর রইল না। যখন শুধু ব্যঙ্গ আর শ্লেষ থাকে, হাসি থাকে না, যখন শুধু দীর্ঘনিশ্বাস আর গোঙানি থাকে, কান্না থাকে না, তখন মানুষ জীবিত থেকেও জীবন্ত নয়। পথের দুপাশে অনেক গোলাপ—সেসব দুপায়ে মাড়িয়ে কি নায়িকা তার মনের শেষ সুর পরিষ্কার করতে পারে? অথচ সবাই জানে যে সাপুড়ে গর্ত থেকে সাপ খুঁজে বের করে, তার বিষদাঁত ভেঙে নিয়ে খেলা দেখায়, এবং ইনামও পায়। আবার একদিন সে-খেলা মরণখেলা হয়ে ওঠে।

এযুগে একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই নিশ্চিতভাবে জানতেন, এবার খেলা-ভাঙার সময় হয়েছে। কিন্তু যাঁরা খেলা দেখতে এসেছিলেন, তারা তো চটে আগুন! মানিকবাবুর কী অধঃপতন! মাঝপথে এইভাবে প্রস্থান করার অর্থ কি দর্শকদের অসম্মান করা নয়? শিল্পকে অশ্রদ্ধা করা নয়? মানিকবাবুর লেখকজীবনের নানা পর্যায় তাই আধুনিক বাংলা উপন্যাসের গতি ও প্রকৃতির 'মাইলস্টোন'।

সে ইতিবৃত্ত থেকে খুব কম লেখকই শিক্ষা নিতে চান। শিল্পীর স্বাধীনতা বলে অনেক ধুলিঝড় আজকার প্রমত্ত বাজারে সৃষ্ট হয়েছে ; আর সেই ধুলিঝড়ে 'শিল্পী' ও 'স্বাধীনতা' উভয়েই অপঘাতে মৃত্যুবরণ করে। ভোরে ডোমের অভাবে সেই মৃতদেহটি শোকহীন কাকশকুনির উৎকৃষ্ট ফলার হয়।

উপন্যাস বা ছোটগল্প বা নাটক বা এমন কি কবিতা—সৃষ্টিধর্মী সকল রচনা পাঠক ও লেখক দুই তরফের সহযোগিতায় গড়ে ওঠে। পাঠক নেই, তবু উপন্যাস হয়েছে—এমন উদাহরণ মিলবে না। উপন্যাস জন্মক্ষণেই পাঠকের মুখাপেক্ষী—যে পাঠক শিক্ষিত, মননশীল এবং জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী। অপরের কথা শুনতে চাই—এই বিশেষ মনোভাব থেকে উপন্যাসের পাঠকের উদ্ভব।

'অপরের কথা শুনতে চাই' এই ইচ্ছার মতো 'অপরের কথা শোনাতেও চাই' এই ইচ্ছাও উপন্যাসরচনার ক্ষেত্রে কম প্রয়োজনীয় নয়। নিজেকে নিয়ে লোকে জবাবদিহি করে, উপন্যাস করে

না। পরকে নিয়েই লোকে উপন্যাস করে। তাই উপন্যাস আত্মজীবনী মাত্র নয়, বরং সে প্রধানত পরজীবনী। এই পরজীবনী সহসা সর্বজনের মনের অন্তরঙ্গ তারে কি করে আঘাত করে? এ প্রশ্ন শিল্পের শাশ্বত প্রশ্ন। এর কোন জবাব নেই, শুধু অনুমান আছে। কিন্তু এটা জানি আমরা যে, যতটা আঘাত করে, লেখকের সাফল্য ততটা সম্প্রসারিত হয়। বাংলা উপন্যাস আজ এই সহজ কথাটা ভুলতে বসেছে। ভরসা এইটুকু যে, সংকটের ভূত শুধু একটি ক্ষেত্রে ভয় দেখায় নি, সর্বক্ষেত্রে তার উৎকট হাজিরা। কেউ কেউ জীবনের পাঁচালী বিকৃত না করেও আধুনিক হয়েছেন। তাঁদের কাছে [illegible]পন্যাস আত্মকূপের কর্দম অন্বেষণ নয়।

সুস্থ, সহজ, সমাজমুখী জীবনের দিনলিপি তাঁরা লিখছেন। এ জগৎ বিস্ময়ের আকর। মানব-[illegible] অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতা। হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষ এদের কথা কতভাবেই না বলছে [illegible] চামড়ার বুকে, পাথরের পিঠে, বৃক্ষের বাকলে, ধাতুর পত্রে ও কাগজের করতলে। তবু [illegible] শেষ হয়নি, কারণ তা শেষ হয় না। শিল্পী এই প্রত্যক্ষ স্পষ্ট ভুবনকে নিয়ে পশরা সাজালে [illegible]লিন, এমন আশঙ্কা সব যুগে ছিল না। আজ অন্তর্মুখী নয়, লেখককে বহির্মুখী হতে হবে। [illegible]থে যে বাস্তব মানুষ বেঁচে আছে, এবং মরে যায়নি, তার বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে। [illegible]সিকের মত নয়, সালতারিখ দিয়ে নয়। অনাবশ্যক আবশ্যক সকল তথ্যের জট পাকিয়ে নয়, শুধু অত্যাবশ্যক ঘটনাগুলিকে সংগ্রহ করে এ ইতিহাস রচনা করতে হবে—যদি রচনার সময় লেখকের গোপন মনের মাধুরী কিছুটা মিশে যায়, তবু আক্ষেপের কিছু নেই।

আজ মন্দভাগ্য মানুষ বারবার সমালোচিত ও ভৎর্সিত হচ্ছে। তার দুর্বলতার জন্য, তার অপারগতার জন্য। এই ভৎর্সনার ভয় জয় করে তাকে এগুতে হবে। নিখিলবাবু আমাদের সকলের হয়ে এই কাজটি করেছেন। তিনি তাঁর বর্তমান উপন্যাসে অনেকগুলি ভাঙা পুতুল নিয়ে গিয়েছিলেন হাজারিবাগ রোডে। আলো হাওয়া তাপ আর অপর্যাপ্ত মাটির প্রলেপে সেই ভাঙা পুতুলগুলোর অনেকখানিই মেরামত তিনি করেছেন। একসময় তারা প্রতিমা হয়ে উঠবে। নিখিল-বাবুর অতসী, সান্ত্ব, অনিল, সন্দীপ—সবাই অনেকখানি নিরাময় হয়ে উঠেছে। উপন্যাস পড়ে বলতে পারি আমাদের বাঁচবার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। দুঃখে সুখে বাঁচা আসলে মানুষেরই মতো বাঁচা। এবং মানুষের জন্য বাঁচা। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের একটি গ্রন্থের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বহু বৎসর পূর্বে লিখেছিলেন, বই পড়ে বোঝা গেল যে গ্রন্থকার একজন অভিজ্ঞ ধাত্রী। নিখিলবাবুর লেখনী এখনও ততটুকু অভিজ্ঞ হয়নি। গল্পের মধ্যে ছেদ ও যতি স্থাপনে, সংলাপের মধ্যে নানা মীড় রচনায়, চরিত্রের মধ্যে নানা অবস্থার উদ্‌ঘাটনে নিখিলবাবুর এখন অনেক সাধনার প্রয়োজন রয়েছে। পথনির্বাচন নির্ভুল; এখন সেই পথের বিঘ্নগুলি, কাঁটাগুলি উপড়ে ফেলতে হবে।

সুরেশচন্দ্র মৈত্র

Burr. *By* Gore Vidal. Random House. New York. $8·95

১৯৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতালাভের দুইশত বৎসর পূর্ণ হবে। মার্কিনীদের স্বদেশভক্তি প্রায় কিংবদন্তীর জিনিস। আমাদের এখানে আড়াই ঘণ্টাব্যাপী অতি নিকৃষ্ট সিনেমা অম্লানবদনে দেখি কিন্তু এক মিনিটের জাতীয় সংগীত শোনবার সময় ভীষণ দরকারী কাজের কথা মনে পড়ে যায়। মার্কিন মুল্লুকের বিস্তারম্ভের প্রথম থেকেই ছেলেমেয়েদের স্বদেশভক্তির পাঠ শুরু হয়। প্রত্যেক শিশু জ্ঞানোন্মেষের পর থেকে শোনে স্বাধীনতাযুদ্ধের বীরদের গাথা। সে গাথার মণিমাণিক্য হলে[illegible] ওয়াশিংটন জেফারসন লাফায়েট প্রভৃতিরা। এই যুদ্ধেরই এক বীর আরন বার। আমেরি[illegible] তৃতীয় উপরাষ্ট্রপতি। জেফারসনের প্রথম রাষ্ট্রপতিত্বের বৎসরে যিনি উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন।

বার মার্কিন ইতিহাসের এক অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক চরিত্র। তাঁর জীবনের অভি[illegible] প্রতিভা বহুমুখী। স্বাধীনতাযুদ্ধে তাঁর বীরত্ব সবস্বীকৃত। সে সময় তিনি পুরোপুরি তা[illegible] পার হন নি। দেশের স্বাধীনতার পর আমরা তাঁকে দেখি অত্যন্ত সফল আইনজীবী[illegible] রাজনীতিতে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ। নিউ ইয়র্ক রাজ্য তাঁর প্রভাবাধীন। তারই ফলে[illegible] উপরাষ্ট্রপতি। সেসময় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যিনি দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট পেতেন তিনিই [illegible]তেন উপরাষ্ট্রপতি। সেবার জেফারসন এবং বার দুজনেই পেয়েছিলেন সমানসংখ্যক ভোট। বার একটু চেষ্টাচরিত্র করলেই রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন। সে চেষ্টা তিনি করেননি। তখন তাঁর ধারণা ছিল রাষ্ট্রপতি তিনি পরে হবেনই। তাঁর আগের দুজন উপরাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উপরাষ্ট্রপতিত্বের শেষের দিকেই তাঁর দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত। এই সময়ে তাঁর সবচেয়ে বিপজ্জনক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী আলেকজান্দার হ্যামিলটনের সঙ্গে বিরোধ চরমে ওঠে এবং পরিণতিস্বরূপ হ্যামিলটনের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় এবং সে যুদ্ধে হ্যামিলটন নিহত হন। সেদিন নিজেদের সম্মান রক্ষার জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধ একটা সম্মানজনক ব্যাপার ছিল কিন্তু বারের বেলায় হল অন্যরকম। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এল দুই-দুইটি রাজ্যে। এ সময় বার উপরাষ্ট্রপতি এবং পদাধিকারবলে তিনি সিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করে চলেছেন। মামলায় তিনি অব্যাহতি পেলেন। রাষ্ট্রপতিপদলাভের জন্য তাঁর সে সময় আর চেষ্টা করে লাভ নেই। কিন্তু তখনো তাঁর দুর্ভাগ্যের শেষ হয়নি। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এলো যে তিনি আমেরিকার তদানীন্তন পশ্চিমাঞ্চলকে নিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়বার ষড়যন্ত্র করছেন। দেশদ্রোহিতার অপরাধে তাঁর বিচার শুরু হলো। এ বিচারেও তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। কিন্তু দেশের হাওয়া তাঁর অনুকূল নয়, তাই তিনি কিছুদিনের জন্য দেশত্যাগ করলেন। পরে দেশে ফিরে আবার আইনব্যবসা শুরু করেন। প্রচুর অর্থ রোজগার করেন, খরচ করেন তারও বেশী। পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

বারকে আমরা চিত্তাকর্ষক চরিত্র বলেছি, বার জনপ্রিয় ব্যক্তিও ছিলেন। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল দুর্বার এবং মেয়েরাও তাঁর প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হতেন। বহু নারী তাঁর স্নেহধন্য ছিলেন এবং বারের ঔরসে বহু সম্রান্ত গৃহে বহু সন্তানের জন্ম হয়েছিল। কিংবদন্তী তাই বলে। বারের শত্রুসংখ্যা ছিল প্রচুর। তার জন্য দায়ী তাঁর চরিত্র। এই ভদ্রলোক ইচ্ছা করলেই

রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন। ইচ্ছা করলে আমেরিকাকে টুকরো করতে পারতেন। কিন্তু জীবনে তাঁর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। এ ধরনের লোক যে কোনো দেশে যে কোনো সময়ে অবাঞ্ছিত এবং হিসাবী লোকদের কাছে বিপজ্জনক। বারের ভাগ্যেও অন্যথা হয়নি।

গোর ভিডাল তাঁর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস এই চিত্তাকর্ষক চরিত্রটিকে নিয়ে লিখেছেন। উপন্যাস শুরু হয়েছে জ্যাকসনের রাষ্ট্রপতিত্বের শেষ দিকে। পরের নির্বাচনে উপরাষ্ট্রপতি মার্টিন ভ্যান বুরিয়েন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দাঁড়াবেন। তাঁকে অপদস্থ করার ষড়যন্ত্র চলেছে। ষড়যন্ত্রের পন্[illegible]াতিয়ার বারের একজন সহকারী—উপন্যাসের একমাত্র কাল্পনিক চরিত্র। তিনি একটি জীবনী [illegible]খবেন এই অছিলায় বারের জীবনীর মালমশলা সংগ্রহ করছেন। বার তাঁর সহকারীকে খুব স্নেহ [illegible] জন্যই নিজের স্মৃতিকথা লিখে তাঁকে দফায় দফায় দিচ্ছেন। এই উপন্যাসটি তাই কিছুটা [illegible]নিতে, কিছুটা বারের জবানিতে হাজির হয়েছে। ভ্যান বুরিয়েনের বিরোধীদের ধারণা [illegible]রজ সন্তান। এরই প্রমাণ সংগ্রহ করার চেষ্টা চলেছে। বইটির শেষ পাতায় একটি [illegible]লেন।

[illegible] ভিডাল উপন্যাসশেষে এক পরিশিষ্টে নিবেদন করেছেন যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের [illegible] হল যে ইতিহাসনিষ্ঠ থেকেও ঐতিহাসিক ঘটনা অদলবদল করা যায় এবং ঐতিহাসিক বা জীবনীকার যা পারেন না তাই করা যায়—বিভিন্ন ব্যক্তির মতলব সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়। ভিডাল আরো বলেছেন যে তিনি কাল্পনিক কথোপকথন ব্যবহার করলেও যেখানে পেরেছেন সেখানেই চরিত্রদের নিজেদের ব্যবহৃত কথাবার্তাই ব্যবহার করেছেন। ভিডাল মার্কিন সাহিত্যের বহুপরিচিত নাম। উপন্যাসটি বের হওয়া মাত্র আলোড়ন তুলেছে প্রচুর। বইটা বিক্রি হচ্ছে খুব, আবার বিতর্কও উঠেছে অনেক। বিতর্কের প্রধান কারণ ভিডাল আমেরিকার লোকগাথার নায়কদের নূতন রঙে রাঙিয়েছেন। জাতির জনক জর্জ ওয়াশিংটন আসলে মোটেই বীর ছিলেন না—যুদ্ধ বুঝতেন না—কোনো বড় যুদ্ধ জেতেন নি—একটু মোটাবুদ্ধির লোক ছিলেন। এর ওপর তিনি ছিলেন দাম্ভিক, গর্বিত আর তোষামোদপ্রিয়। বয়স লুকোবার জন্য গালে লাল রঙ মাখতেন। রাজার আসনে বসবার ইচ্ছা ছিল তাঁর, একথা ভিডাল বলিয়েছেন বারের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ভিডাল একথাও বলেছেন যে ওয়াশিংটনের টাকাপয়সার জ্ঞান ছিল টনটনে।

জাতির জনকের যদি এই অবস্থা হয় তবে অন্যে পরে কা কথা। এই বই পড়বার পর আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের বহু সেনানীকেই বীর স্বদেশপ্রেমিক না মনে হয়ে মনে হবে চোর জোচ্চর অর্থগৃধ্নু এবং কপট। কপটতার অভিযোগ বারের মুখে প্রায় সকলের বিরুদ্ধেই ভিডাল এনেছেন, একমাত্র ব্যতিক্রম এ্যানড্রু জ্যাকসন। তবে বারের আসল ক্রোধ টমাস জেফারসনের ওপর। শুধু মাত্র মার্কিন দেশে নয়, সারা বিশ্বে টমাস জেফারসন স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ পূজারী বলে খ্যাত। ভিডালের বইতে তিনি পয়লা নম্বরের অপরাধী। তাঁর অপরাধের শেষ নেই—তিনি মুখে যতই সমস্ত মানুষ সমান বলে ঘোষণা করুন না—স্ত্রীলোক, দাস এবং রেড ইণ্ডিয়ানদের বেলা একথা মানতেন না। তাঁর অধীনে যত নিগ্রোদাসী ছিল প্রায় প্রত্যেককে জেফারসন উপপত্নী হিসাবে ব্যবহার করতেন। টাকাপয়সা সম্বন্ধে মোটেও সৎ ছিলেন না। জেফারসন পররাজ্যলোলুপ ছিলেন এবং

পারলে মেক্সিকো এবং কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রভুক্ত করতেন। এ সমস্তই বারের অভিযোগ (অথবা ভিডালের) । মার্কিন দেশে বাকস্বাধীনতার সম্বন্ধে বারের মুখে ভিডাল বলিয়েছেন বাকস্বাধীনতার অর্থ হল সবাই যে কথা বলছে সে কথা বলার স্বাধীনতা। এ ধরনের ছোটখাট মণিমুক্তা ৪৩০ পাতার বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো ছিটানো রয়েছে।

বইটি সম্বন্ধে কিছু ঐতিহাসিক আপত্তি তুলেছেন—তাঁদের বক্তব্য ঔপন্যাসিকের ঐতিহাসিক হওয়া কিংবা ঐতিহাসিকের ঔপন্যাসিক হওয়া দুইই অনুচিত। ভিডাল যা করেছেন তা না ইতিহাস না উপন্যাস। অন্য পক্ষের লোকেরা বলেছেন কিংবদন্তীর সঙ্গে সত্যের কোনো সম্পর্ক নেই; কিংবদন্তীর মোড়ক ছাড়ালে যা বেরিয়ে আসছে তা দেখে কষ্ট পেয়ে লাভ নেই। কিন্তু তবু ভিডা[illegible] বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েইছে যে তাঁর আসল উদ্দেশ্য মানীব্যক্তিদের গায়ে কাদা ছোঁড়া।

ইতিহাস ব্যাপারটা এখন আর সহজ ব্যাপার নয়। তার নানারকম ব্যাখ্যান, না[illegible] বিভিন্ন মতবাদের চশমা দিয়ে ইতিহাস দেখাই এখন রীতি। যেখানে চশমার রঙে[illegible] মিল নেই সেখানে ঐতিহাসিক স্বচ্ছন্দে আপন মনের মাধুরী মেশান। আমাদের দেশে[illegible] ঐতিহাসিকরা করছেন। সুতরাং একজন ঔপন্যাসিক যদি সেটা করেন তবে মারাত্মক [illegible] নেই। এই অতি সুখপাঠ্য বইটি পড়তে পড়তে আমার নিজের দেশের কোনো কোনো নাট্যকার ঔপন্যাসিককে মনে পড়ছে, যাঁরা বাংলার রেনেসাঁর আসল নায়ক হিসাবে খুঁজে পান একজন ঝাড়ুদারকে আর সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক করেন বাঙালী তন্তুবায় সন্তানকে। গোর ভিডালও তেমনি খুঁজে পেয়েছেন আরন বারকে। গোর ভিডালের কলমের গুণে অষ্টাদশ শতকের বারের দেশদ্রোহিতার মামলা একেবারে সমসাময়িক হয়ে উঠেছে।

ভিডাল বরাবরই তাঁর পাঠকদের চমক দেখিয়েছেন আঙ্গিকের আর বিষয়বস্তুর নূতনত্বে।

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রস্মৃতি—পরিমল গোস্বামী। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। কলিকাতা, ১২। মূল্য বাইশ টাকা।

শুকের মুখে বা ঘোড়ার ডাকে চিঠি পাঠানোর রেওয়াজ অনেক কালের পুরনো হলেও, সেগুলোকে সংগ্রহ করার সদিচ্ছা নিতান্তই হাল আমলের। বলা যেতে পারে, জীবনী-ইতিহাসের উপকরণ হিসেবেই প্রথম চিঠি সংগ্রহ ও সংকলনের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়। সংবাদমূল্যের অতিরিক্ত গুণে চিঠির মর্যাদা আরও পরবর্তীকালের। সেদিক থেকে এখনও চিঠির জাত দু-ধরনের : এক, যেখানে কোনো অজ্ঞাত তথ্যের বা পত্রলেখকের কোনো অবগুণ্ঠিত মতের পরিচয় আছে ; দুই, চিঠি যেখানে সাহিত্যের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। যেদিক থেকেই দেখা যাক্-না কেন, ব্যক্তিত্বের গূঢ় পরিচয়ে চিঠির অসামান্য গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত।

কিন্তু চিঠির স্বত্ব যেমন একই সঙ্গে লেখকের ও প্রাপকের, তেমনি লেখকের মনোভাব চিঠিতে

যেমন ধরা পড়ে, প্রাপকের মনোভাবও কি কিছুই পড়ে না ? পড়ে অবশ্যই। আমাদের দেশেই তার উদাহরণ আছে শ্রীদিলীপকুমার রায়ের "তীর্থঙ্কর" অথবা নরেন্দ্র দেব ও শ্রীযুক্তা রাধারানী দেবীর পত্র-সংগ্রহে— যার অংশমাত্র প্রকাশিত হয়েছে "কথাসাহিত্য" পত্রিকায় এই সাহিত্যিকযুগলের সংবর্ধনা-সংখ্যায়। এই দুই পত্রগুচ্ছ পড়লেই বোঝা যাবে, এঁদের মন কতো সজাগ ছিলো, কতো বিচিত্র বিষয়ে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ছিলো।

কোনো সাংবাদিক একবার রসিকতা করে বলেছিলেন, সাংবাদিকরা এ-কালের কাঁটালী কলা। পঙ্ক্তসব বিদ্যাজীবীদেরই ক্ষেত্রভেদ আছে, সাংবাদিকের নেই। জাত সাংবাদিকের নিশ্চয়ই আছে; [illegible] নাম করতে পারি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বা হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের। কিন্তু পত্রিকার বিক্রি [illegible] জন্য যাঁরা শ্রদ্ধেয়দের গাল পাড়ার সহজ পথ বেছে নেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এই দলভুক্ত নন। [illegible] সঙ্গে পরিমল গোস্বামীর মতো সাংবাদিকের তফাত ঐ শ্রদ্ধা করার শিক্ষায়। শ্রদ্ধা [illegible] হয়নিনো নয়। তাই বেশিরভাগ চিঠির মধ্যেই আছে এক সরস কৌতুকোজ্জ্বল রসিকতার [illegible] কালে শনিমণ্ডলীর সভ্য হয়েও এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা। তিনি নিজেকে সম্মান করতে [illegible]তাই নিজের সামর্থ্যের সীমা ডিঙিয়ে তাঁর পরিচিত কৃতীপুরুষরা তাঁদের স্বক্ষেত্রে কতোটা সাধর্ম ও সদ্ব্যয়ী সেই অনধিকারচর্চায় তিনি উৎসাহ পাননি। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতো বিজ্ঞানসাধক থেকে একাধিক বিখ্যাত সাহিত্যসেবী, পর্বতারোহী তপতী বিশ্বাস থেকে নিখিল দাসের মতো মজলিসী সহৃদয় (!) বন্ধু—সকলের সঙ্গেই তাঁর মিতালির সম্পর্ক, সকলেই জন্যই তাঁর কৌতূহল। সেইটুকুতেই তাঁর খুশি। তিনি সর্বজ্ঞ নন, কিন্তু সকল রসের রসিক। তাই বয়োজ্যেষ্ঠ থেকে শুরু করে পৌত্র-দৌহিত্র সকলের প্রতিই তাঁর অনাবিল শ্রদ্ধা। পরিমলবাবুর "পত্রস্মৃতি" পড়ে উঠে এ-কালে দুর্লভ এই স্বাতন্ত্র্য প্রথমেই মনে রেখাপাত করে। আর করে বলেই, এমন অনেকে আছেন তাঁর এই বিপুল সংকলনে, মহাকাল নয় সমকালেও যাঁরা হয়তো তেমন খ্যাতিমান নন, তাঁদেরও অবজ্ঞা করা যায় না কিছুতেই।

পরিমলবাবু সচেতন, তিনি ঐতিহাসিক নন, অহংবর্জনের সাধনায়ও হয়তো তাঁর মোক্ষলাভ ঘটেনি এখনও, তাই সবিনয়েই সম্ভবত তিনি বেছে নিয়েছেন স্মৃতিচারণের পথ। কিন্তু লক্ষ্য তাঁর ঐতিহাসিকেরই। "স্মৃতিচিত্রণ", দ্বিতীয় স্মৃতি", "আমি যাঁদের দেখেছি", "পত্রস্মৃতি" (এবং তারও পরে প্রকাশিত "যখন সম্পাদক ছিলাম")—একাদিক্রমে এই গ্রন্থপরম্পরায় তিনি যেন একটা যুগের চরিত্রকেই ধরতে চাইছেন, অন্তত তাঁর অভিজ্ঞতায় যে-যুগের প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর জীবিকার গুণেই বহু আপাততুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়েও তিনি এমন অনেক বড়ো মনের পরিচয় পেয়েছেন, যেখানে স্বভাবতই মন শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে। কোনো শ্রদ্ধা-বিরাগী সে-মনোভাবকে নানা বিশেষণে লঘু করার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু সত্যতা বিষয়ে কটাক্ষ করতে পারবেন না। তাঁর স্মৃতিচারণগুলিতে যা ছিলো বিবৃতি, "পত্রস্মৃতি"তে তারই নিরম্বু তথ্যের দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু শুধু কি তথ্য-প্রমাণ বিবাদ-ভঞ্জন ? আসলে, পরিমলবাবুর ঝাঁপিতে দুই জাতের চিঠিই আছে—মেজাজের এবং কাজেরও।

কিন্তু চিঠিও হয়তো এখানে ধরতাই। সেই সুতোর গুন টেনেই তিনি ফিরিয়ে আনছেন বহু জড়িত ঘটনা এবং প্রয়োজনমতো ঘটনাগুলোর পরিচয়ও দিয়েছেন তখনকারই লেখার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করে। আর এ-সব ক্ষেত্রেই যাঁরা "স্মৃতিচিত্রণ" থেকে "আমি যাঁদের দেখেছি" পর্যন্ত পড়ে এসেছেন তাঁদের কাছে বেশিরভাগই মনে হয় পুনরুক্তি। এমন-কি একাধিক চিঠিও আগের বইগুলোতে মুদ্রিত। অসম্ভব নয়, বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য প্রথম দুটি বইয়ের পুনর্মুদ্রিত হওয়ার আশু সম্ভাবনা নেই বলেই "পত্রস্মৃতি"র পাঠকের শ্রমলাঘব করে দিয়েছেন লেখক। প্রকৃতপক্ষে এখন পর্যন্ত শেষতম প্রকাশিত গ্রন্থটিকে ধরলে পাঁচটি বই একই বইয়েরই অঙ্গ। পরিমলবাবুকে অনুরোধ করবো, সম্ভব হলে এগুলিকে একত্রিত করে একটি বই করতে। বহু পুনরুক্তি তখন আপনা থেকেই বর্জিত হতে পারবে— পাঠকের স্মৃতিকে উসকে দেওয়ার জন্য উদ্ধৃতিও বাহুল্য হবে। ইদানীংকালের বইতে [illegible] থাকে না, "পত্রস্মৃতি" সে-বিচারে একেলে বই নয়। আর সন্ধানীদের পক্ষে এ-বই সর্বকালের [illegible]